প্রকাশক :—
শ্রীসুব্রত চৌধুরী
আগমনী প্রকাশক
৯৭ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯

প্রথম সংস্করণ—১৩৬৪

—আড়াই টাকা—

STATE CENTRAL LIBRARY; WEST BENGAL
ACCESSION NO. দা ৮৬১৫
DATE ১৮/০৪/২০০৬

মুদ্রাকর :—
শ্রীসত্যকুমার চ্যাটার্জ্জি
চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্স
৪২এ, মলঙ্গা লেন, কলিকাতা-১২

স্মরণায় প্রদত্তমিদমর্ঘং দেশকর্ম্মিণাম্

করকমলেষু—

# পরিচিতি

স্ফুলিঙ্গের বিষয়বস্তু দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের যে অংশ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার মধ্যে পড়ে।

ইহার পূর্ববর্তী তুইখানি উপন্যাস "রাজনগর" ও "দেবানন্দ" আন্দোলনের ১৯০৫—১৯০৬ (প্রথমার্দ্ধ) এবং ১৯০৬—১৯০৮ (প্রথমার্দ্ধ) পর্যন্ত ইতিহাস আশ্রয় করিয়া লিখিত হইয়াছে।

স্ফুলিঙ্গে বিষয়বস্তুর বর্ণনায় বিভিন্নখাতে প্রবাহিত আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস লক্ষিত হইবে, যদিও স্বভাবতঃই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদের ধারা। সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক ঘটনা ও দলীয় রাজনীতির বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে জাতির ঐক্য ও দেশের মুক্তিকামী জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিকোণ হইতে।

রাজনগর ও দেবানন্দের মত স্ফুলিঙ্গ ডকুমেণ্টারী উপন্যাস, ঐতিহাসিক রোমান্স নয়। ডকুমেণ্টারী উপন্যাস অর্থাৎ পরাধীন দেশের জাতীয় আন্দোলনের এবং সেই আন্দোলনের বাধাবিপত্তির এবং তুর্বলতার প্রামাণিক ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস। এই ইতিহাস সম্পূর্ণ অবিকৃত ও নির্ভরযোগ্য। গল্প আবর্তিত হইয়াছে সমসাময়িক কালের ইতিহাসের আবর্তন অনুসরণ করিয়া। আন্দোলনের সর্বাঙ্গীন চিত্রায়নে নির্দিষ্ট ভূমিকায় দেখা দিলেও গল্পের প্রধান চরিত্রগুলি বিকশিত হইয়াছে নিজ নিজ ধারায়, মানুষ হিসাবে তাহাদের স্বভাবের তাগিদে। অপ্রধান চরিত্রগুলি তৎকালীন সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের চিত্র পরিস্ফুটনে সাহায্য করিয়াছে।

কাছারী বাড়ীর সম্মুখের বাগানে নিজে গিয়া ত সে আর ফুল তুলিতে পারে না।

শুধু বাগান নয়, আরও অনেক কল্পনা আছে লক্ষ্মীর মাথায়। বাগানের মধ্যে একটা ইটের গোল লাল রং করা বেদী হইবে তাহাদের দুই জনের বসিবার জন্য। বেদীর চারদিকে সরু বাখারির বেড়া হইবে, যাতায়াতের জন্য খানিকটা ফাঁক থাকিবে। এই বাখারির বেড়ার গায়ে তরুলতা উঠিবে। এই তরুলতা যখন বাড়িয়া বেড়া ঢাকিয়া ফেলিবে—

বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে শব্দ শুনিয়া ইন্দ্র ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল। দরজার আড়ালে তাহার দিকে চাহিয়া লক্ষ্মী মৃদু হাসিতেছে।

ইন্দ্র চাহিয়া দেখিল লক্ষ্মীর বৈকালিক প্রসাধন শেষ হইয়াছে। সে একখানি জমকালো জামদানি শাড়ি পরিয়াছে আজ, শাড়িখানিতে তাহাকে মানাইয়াছে চমৎকার।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—কাছে এসো দেখি। মনে হচ্ছে তোমার সই ঠাকরুণ এসেছেন।

লক্ষ্মী হাসিয়া ঘরের মধ্যে এক পা সরিয়া গেল। বলিল—সই জোর করে পরিয়ে দিল।

পিছনে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া সে বলিল—সই পালাচ্ছে। সেই ত এখানে ধরে আনলো জোর করে।

লক্ষ্মীর সইয়ের নাম কামিনী বৌ। কামিনী বৌয়ের বয়স লক্ষ্মীর বয়সের দেড়গুণ, তাহা হইলেও সে লক্ষ্মীর সই।

কামিনী বৌ গ্রামের এক দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের গৃহিণী। খুব লম্বা চওড়া, লোকে বলিত মেয়ে কাবুলীওয়ালা। গায়ের রং ফরসা। চোখা নাক, নাকের ডগা সম্মুখে একটু বাঁকিয়াছে। মেয়ে মানুষের ঐ রকম নাক নাকি কুলক্ষণ। লোকে বলিত সেই জন্য নাকি বাপের বাড়ির অবস্থা সচ্ছল হইলেও কামিনী দরিদ্রের ঘরে পড়িয়াছিল। সম্মুখে দুইটা দাঁত একটু উঁচু, রীতিমত মজবুত দুই চোয়াল। এই চোয়ালের জোরে কামিনী বৌ আস্ত সুপারি মাড়ির দাঁতে আটকাইয়া এক চাপে ভাঙিয়া ফেলিত। এই কৃতিত্বের জন্য গ্রামে সে "সুপারি-ভাঙা কামিনী বৌ" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

কামিনী বৌয়ের পরিবার উপযুক্ত শাড়ি দোকানে কিনিতে পাওয়া যাইত না। রাজনগরের জোলাদের কাছে ফরমায়েস দিয়া তাহার জন্য শাড়ি তৈয়ারী করাইতে হইত।

কাজকর্মে কামিনী বৌ খুব খাটিতে পারিত। একা হাতে তিন চারি শত লোকের রান্না করিতে পারিত সে। এত কাজের মানুষ বলিয়া বড় বড় ক্রিয়া কর্মের সময়ে লোকে তাহাকে খোশামোদ করিয়া ডাকিয়া লইয়া যাইত।

কামিনী বৌয়ের স্বামীর চেহারা ছিল তাহার চেহারার একেবারে বিপরীত। বেঁটে, কালো, রোগাটে মানুষ। মাথা জুড়িয়া টাক। আগে রাজনগরের এক জমিদার সরিকের বাড়ীতে নায়েবের কাজ করিত। তহবিল ভাঙ্গিয়া জেলে যাইবার মত হইয়াছিল, কামিনী বৌয়ের চেষ্টায় বাঁচিয়া যায়। স্বামী মনিবের তহবিল ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়া কামিনী বৌ নাকি ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর কোমর ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ঘরের রোয়াক হইতে উঠানে ফেলিয়া দিয়াছিল। সাতদিন ভদ্রলোক বিছানা হইতে উঠিতে পারে নাই গায়ের ব্যথায়। মনিবপক্ষের কানে এই কাহিনী পৌঁছিলে তাঁহারা বলিলেন জেলের অধিক শাস্তি বেচারার ঘরেই হইল, আর জেলে পাঠাইয়া কি হইবে।

পূজার সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া কামিনী বৌয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর খুব ভাব হইয়া গেল। তারপর তাহারা সই পাতাইল। মাঝে মাঝে কামিনী বৌ আসিয়া লক্ষ্মীকে সাজাইয়া দেয়, নিজের হাতে ভাল ভাল রান্না করিয়া ইন্দ্র ও লক্ষ্মীকে খাওয়ায়। লক্ষ্মীও তাহাকে নানাভাবে সাহায্য করে।

তাহার আহ্বানে লক্ষ্মীকে ঘরের মধ্যে সরিয়া যাইতে দেখিয়া ইন্দ্র আসন ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইল।

বলিল—তোমার সই ভাল করেন নি। অনিচ্ছুক মানুষকে জোর করে আনা কি ভাল?

লক্ষ্মীর ঘরের মধ্যে আরও সরিয়া গেল। হাসিমুখে বলিল—অনিচ্ছুক কি করে বুঝলে?

ইন্দ্র—অনিচ্ছুক না হলে কেউ পালায়? সই কেন তোমাকে ধরে এনেছেন জানো?

লক্ষী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তেমনি হাসিয়া বলিল—কি করে জানবো? সই আমাকে তো বলে নি।

ইন্দ্র তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—বাঃ, এ যে দেখছি স্বয়ং ইন্দ্রাণী।

লক্ষী মুখ তুলিয়া স্বামীর মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিল, তখনই মাথা নামাইল। ইন্দ্র দেখিল স্ত্রীর চোখে এক আশ্চর্য আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে চিনিল লক্ষীর অন্তরতম হৃদয় হইতে বিচ্ছুরিত এ সেই আলো যাহার মায়া স্পর্শে তাহার পৃথক সত্তার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়।

গত তিন বৎসরে এই আলোর স্পর্শ সে মাঝে মাঝে পাইয়াছে।

ইন্দ্র সর্বদা অনুভব করে স্নেহে কোমল, আগ্রহে উন্মুখ, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ একটি হৃদয়, অতিশয় শান্ত, আয়ত দুইটি চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ আলোক মণ্ডল রচনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে বেষ্টন করিয়া। কবে হইতে লক্ষীকে ইন্দ্র ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহার মনে পড়ে না। বিবাহের পরে সে উপলব্ধি করিল তাহার ভালবাসা লক্ষীর রূপকে আশ্রয় করিয়া জন্মে নাই, জন্মিয়াছিল লক্ষীর মধ্যে তাহার নিজের হৃদয়ের ও মনের অপূর্ণতা পূর্ণতা লাভ করিবার আশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া। সে আশ্বাস মিথ্যা হয় নাই সে জানিত। সে জানায় যেন আশা মিটে নাই তাই লক্ষীর মনের গোপন কথা জানিবার জন্য সে লক্ষীকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কবে হইতে সে ইন্দ্রকে ভালবাসে, কতখানি ভালবাসে। প্রশ্ন শুনিয়া লক্ষী মুখ তুলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল, দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চোখে এক আশ্চর্য আলো ফুটিয়া উঠিল। ইন্দ্রের মনে হইল সেই আলোর প্রভায় লক্ষীর সমগ্র হৃদয়খানি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। লক্ষী চোখ বুঁজিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল। ইন্দ্রের কি মনে হইল লক্ষীর মুখখানি বুকে চাপিয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল—আমার কথার উত্তর তো দিলে না।

তবু লক্ষী উত্তর দেয় না। ইন্দ্র কোন মতে ছাড়িবে না। স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া রাখিয়াই লক্ষী অবশেষে অস্ফুট স্বরে বলিল—তোমার টানেই তো আমি এসেছি। তুমি যে আমার জন্মজন্মান্তরের দেবতা।

উত্তর শুনিয়া ইন্দ্র মনে মনে হাসিয়াছিল। হাসিয়াছিল লক্ষীর মনের কথা

ইন্দ্রকে দেখিয়া উকিল বাবু উঠিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে গেলেন।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—কেসের অবস্থা কেমন বুঝছেন?

উকিলবাবু বলিলেন—দেবানন্দের বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ পুলিশ সংগ্রহ করেছে দলের লোকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণ করবার জন্ত। শাস্তি নিশ্চিত, তবে দ্বীপান্তর কি জেল হবে বলা যায় না। নন্দলাল বাঁড়ুয্যের হত্যা ও ওভারটুনহলে স্যর এনড ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টার পর পুলিশ উঠে পড়ে লেগেছে। এই প্রথম কয়েক ঝাঁক ধরা পড়েছে, আরও কত ধরা পড়বে কে জানে? কাকিনাড়া বোমার ব্যাপারে পুলিশ ধরল কিনা ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্নকে। মোক্ষদা সামধ্যায়ীর মত নিরীহ পণ্ডিতকে ধরেছে ডাকাতির চার্জে। ওঁরা দুজনেই জেল হাজতে পচছেন। মেদিনীপুর বোমার ব্যাপারে গোটা মেদিনীপুর চষে ফেলেছে পুলিশ, নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলালকে পর্যন্ত হাজতে পুরেছে। দুটো নূতন আইন, Newspapers Incitement to Offences Act ও Explosives Act হয়েছে, আবার শুনছি ক্রিমিনাল ল এমেণ্ডমেণ্ট বিল আসছে। দেশের যেখানে যত সমিতি, আখড়া, ক্লাব, পাঠাগার আছে সব বন্ধ করে দেবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা কথায় আছে, যাকে পুলিশ ছোঁবে তার কোন মতে নিষ্কৃতি নাই।

ইন্দ্র বলিল—একবার দেবুদার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

উকিল—অসম্ভব। নরেন গোঁসায়ের হত্যার পরে পুলিশ আসামীদের সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছে।

ইন্দ্র অনুনয় করিয়া বলিল—আদালতের মধ্যেই না হয় দেখা করব। যদি আপত্তি হয় কথাবার্তা বলতে চাইনে, শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে চাই।

উকিলবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, তুমি যখন বলছ আমি মিঃ সি. আর দাশের কাছে কথাটা তুলব। তুমি কাল বারোটার পর কোর্টে যেও।

ইন্দ্র বাড়ী ফিরিবার কিছুক্ষণ পরে দেবনাথ ক্লাব হইতে ফিরিল।

ইন্দ্র ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়াছে ক্লাব হইতে দেবনাথ স্বাভাবিক

অবস্থায় ফিরে না। আরও লক্ষ্য করিয়াছে অন্য সময়ে সে কিছু গম্ভীর থাকে কিন্তু ক্লাব হইতে ফিরিবার পরে তাহার বক্তৃতাপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়, ভাবাবেগ ও বৃদ্ধি পায়। ইন্দ্রের আবিষ্কার করিতে বিলম্ব হয় নাই যে ইহার কারণ দ্রব্যগুণ।

ইন্দ্রের খোঁজ পড়িল। ইন্দ্র আসিয়া বসিতে দেবনাথ বলিল—তুমি তো শুনতে পাই টেররিষ্ট দলের লোক, আজকের খবর রাখো? ডাটা-গুপ্তা ক্লাবে কানাইলাল দত্তের ক্রিমেশনের বর্ণনা করছিল। রীতিমত পোয়েটিক বর্ণনা।

একটু থামিয়া আবার বলিল—তোমাদের এই বোমাওয়ালাদের ওপর আমার বিশেষ আস্থা নেই, গীতা ও পিকরিক এসিড মিলিয়ে এরা এমন একটা আজব কাল্ট বানিয়েছে যার অর্থ বোঝা কঠিন। বাট থাই মাষ্ট সে কানাই দত্ত ওয়াজ গ্রেট। ডাটা গুপ্তার বর্ণনা শুনে আমারও চোখে জল এসেছিল।

একটু পরে বলিল—স্যর হার্ভে এডামসন টেরিরিষ্টদের কি সম্বন্ধে বলেছেন জানো? "The timid Bengali has been turned into a fanatical Ghazi". কানাইএর দৃষ্টান্ত।

দেবনাথের রাজনৈতিক মতের একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

দেবনাথ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশনের সভ্য, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির শিষ্য, কিন্তু "মেটা মজলিস" বা কনভেশননিষ্ট কংগ্রেস, অর্থাৎ সুরাট কংগ্রেস ভাঙিয়া যাইবার পরে মডারেটদল যে সভা করেন, তাহাতে যোগ দেয় নাই। গভর্ণমেণ্টের কাছে মডারেট দলের প্রতিপত্তি আছে কিন্তু জনপ্রিয়তা লাভ করিতে হইলে নেশনালিষ্ট দলে যোগ দিতে হয়। সরাসরি নেশনালিষ্ট দলে যোগ দিতে সে ভরসা করে নাই। নিরাপদ পন্থা হিসাবে সে দুই নৌকায় পা দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সমাজের শিক্ষিত, সচ্ছল অংশের রাজনৈতিক মত কতকটা এই প্রকার ছিল। তাঁহাদের অনেকে প্রকাশ্যে বিপ্লববাদের সমালোচনা করিতেন, ব্যক্তিগত জীবনে বিপ্লবীদের এড়াইয়া চলিতেন আবার গোপনে মধ্যবর্তীর হাত দিয়া বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করিতেন। বিপ্লববাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকের মনে কিছু মোহ ছিল। বিপ্লবীদের সম্পর্কে হয়ত কিছু ভয়ও ছিল।

নৈশ আহার প্রস্তুত হইবার খবর আসিল। দেবনাথ কাপড় বদলাইবার জন্য উঠিল।

দেবনাথ চলিয়া গেলে রাধারাণী আসিল। বলিল, আসুন ঠাকুরপো, আপনার ঘরে খাবার দিতে বলেছি।

তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল—আজ সহজে নিষ্কৃতি পেলেন, আপনার বরাত ভাল। কান্না আরম্ভ হলে আরও অনেকক্ষণ চলত।

ইন্দ্র রাধারাণীর মুখের দিকে চাহিল। কথাটা শুনিয়া মনে হইল বিদ্রূপ, মুখের ভাবে কিছু বোঝা গেল না।

পরদিন সকালে ইন্দ্র খবরের কাগজ পড়িতেছিল। কানাইলালের শেষকৃত্যের বিস্তৃত বিবরণ ও ছবি বাহির হইয়াছে। এই বিবরণ পড়া হইলে অন্য পৃষ্ঠায় দেখিল সংবাদ দিতেছে তুর্কীতে এনভার বের নেতৃত্বে ইয়ং তুর্ক পার্টির জয়লাভ। আরও সংবাদ দিয়াছে দক্ষিণ 'আফ্রিকায় ভারতীয় নেতা মি. এম. কে. গান্ধীকে কয়েদীর পোষাকে রাজপথে হাঁটাইয়া লওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রের মনে পড়িল মাসখানেক আগে মি. গান্ধীর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ ও জেলখানায় তাঁহার খোয়া ভাঙ্গিবার সংবাদ কাগজ পড়িয়াছিল।

দেবনাথ হাইকোর্টে বাহির হইবার পরে ইন্দ্র আহার শেষ করিয়া আলিপুর আদালতের দিকে রওনা হইল। আদালতের বাহিরে পুলিশের পাহারার কড়াকড়ি দেখিয়া সে ভাবিতে লাগিল কি ভাবে দেবানন্দের উকিলকে তাহার আসিবার সংবাদ পাঠাইবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর তাঁহাকে প্রাঙ্গনের একাংশে অন্য কয়েকজন উকিলের সঙ্গে আলাপরত দেখিয়া সে অগ্রসর হইয়া তাঁহার কাছে গেল।

ইন্দ্রকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—বীচক্রফট্ সাহেব অসুস্থ, কেস আজ হবে না।

ইন্দ্র নিরাশ হইল।

মোকদ্দমার সম্বন্ধে বাকী প্রয়োজনীয় কথাবার্তার শেষ সে বলিল,—আমি আজ দেশে ফিরছি। দু'একদিনের মধ্যে বাকী টাকা পাঠিয়ে দেব।

উকিলবাবু জানাইলেন দুই একদিন থাকিয়া গেলে হয়ত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

রঘুনাথ চাকুরি করিতে লাগিল। শরৎসুন্দরী দেবরের বিবাহের কথা পাড়িলেন। রঘুনাথ বিবাহ করিতে রাজি হইল না। ভ্রাতৃজায়াকে বলিল—আর দু'চার বছর পরে ব্রজনাথের বিয়ে দিও, তোমার সাহায্য করার মানুষ পাবে বৌদি।

দীননাথের দ্বিতীয় পুত্র আদিনাথ তাহার কাছে থাকিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে মানদার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল রাজনগরের স্কুলের হেডমাষ্টার রাজেনবাবুর ছেলে রাঘবের সঙ্গে।

দীননাথের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজনাথ অত্যন্ত মেধাবী ছেলে। রঘুনাথ যখন চাকুরি করিতেছিল সে একে একে সকল পরীক্ষা খুব ভালভাবে পাশ করিয়া কলিকাতার এক কলেজে চাকুরি পাইল। বাসা করিয়া সে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সোমনাথকে নিজের কাছে রাখিয়া পড়াইতে লাগিল। শরৎসুন্দরী ছেলের বিবাহের কথা তুলিলেন। ব্রজনাথ বলিল—কাকা বিয়ে করলেন না। আগে তাঁর মত করাও মা।

দীননাথের বয়স হইয়াছিল। বছর দুই হইল তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। চিকিৎসাপত্রে সুফল পাইলেন না। ক্রমে তিনি প্রায় অন্ধ হইলেন, দিনের আলোতেও সব জিনিস ঝাপসা দেখেন। অন্ধ দীননাথ মনকে বুঝাইলেন তাঁহার অন্ধত্ব গোবিন্দজীর দান। গোবিন্দজীর চিন্তায় তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

এদিকে দীননাথের শান্তির সংসারে দুঃখ ও অশান্তির ছায়া নামিল।

এক ছুটি উপলক্ষে রঘুনাথ ও আদিনাথ বাড়ী আসিয়াছে। ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে তবু রঘুনাথ যেন অতিশয় ব্যস্ত। প্রায়ই তাহার কাছে অপরিচিত ছেলেরা আসে, তাহাদের লইয়া অনেক পরামর্শ হয়, আলোচনা হয়। দেবরের অনুরোধে শরৎসুন্দরীকে ইহাদের জন্য আহার্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। এত অপরিচিত ছেলের আনাগোনায় শরৎসুন্দরী একটু বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া উত্তর দেয়—এরা আমার বন্ধু, আমার সঙ্গে ধর্মালোচনা করে।

শরৎসুন্দরীর বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিশেষ কিছু আর বলেন না। ইতিমধ্যে জামাই, পুলিশের দারোগা রাঘব, আসিয়া কয়েকদিন শ্বশুর বাড়ীতে কাটাইয়া

অন্দরে আসিয়া ইন্দ্র লক্ষ্মীকে বলিল—আদিকে কিছু খেতে দাও। আমরা এখনই বেরুব।

লক্ষ্মী বলিল—বাবার কাছে একবার যাওয়া দরকার। তোমার ফেরবার খবর পেয়ে তিনি হয়ত অপেক্ষা করছেন।

ইন্দ্র বলিল—আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।

আদিনাথকে খাইতে দিয়া লক্ষ্মী বলিল—তুমি ছিলে না, পুলিশকে নিয়ে বড় হাঙ্গামায় পড়েছিলেন আদি ঠাকুরপো।

আদিনাথ মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলিল—পুলিশের হাঙ্গামার অনেক অভিজ্ঞতা আছে বৌদি, সেদিনকার হাঙ্গামা নূতন অভিজ্ঞতা নয়। কাকাবাবুকে গ্রেপ্তার করতে এসে তল্লাসীর নামে আমাদের বাড়ীতে পুলিশ যে অত্যাচার করেছিল, আমার বৃদ্ধ, অন্ধ বাবাকে, মাকে পর্যন্ত যে ভাবে লাঞ্ছিত করেছিল সে কথা কোনদিন ভুলব না। আর ভুলব না এইসব নীচমনা অত্যাচারী আমারই দেশের লোক। কাকাবাবুর জন্য দুশ্চিন্তা ও মনের গ্লানিতে বাবা মারা গেলেন। পুলিশ বাড়ী তল্লাস করেছিল, ডাকাতির অভিযোগে কাকাবাবুকে গ্রেপ্তার করেছিল, এজন্য ভয়ে গ্রামের লোক শবদাহ করতে আসতে চায়নি, দেশের লোকের পুলিসের ভয় এতই বেশী। দেখেশুনে মন থেকে তাই পুলিশের হাঙ্গামার ভয় দূর করেছি বৌদি।

আদিনাথের পরিবারেব এই দুঃখের ইতিহাস ইন্দ্রের কাছে লক্ষ্মী আগে শুনিয়াছে। সে আর কোন কথা বলিল না।

আদিনাথের খাওয়া শেষ হইলে ইন্দ্র ও সে পথে বাহির হইল। আদিনাথ সেবকাশ্রমের পথ ধরিল, ইন্দ্র টোল পাড়ায় শ্বশুরালয়ের দিকে চলিল।

জীবানন্দ ইন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

জীবানন্দের বয়স এখন দশ বৎসর বেশী দেখায়, শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পুত্র বোমার মামলার আসামী, ভাগ্যের এই পরিহাসে তাঁহার প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম সব গিয়াছে। লোক চক্ষুর আড়ালে থাকিতে পারিলে তিনি যেন বাঁচিয়া যান। কাহারও সহিত বিশেষ মিশেন না। পূজা অর্চনায় অনেক সময় যায়, বাকী সময় শাস্ত্র চর্চায় কাটাইয়া দেন।

ইন্দ্র আসিয়া তাঁহার কাছে বসিলে খবর পাইয়া ত্রিনয়নী সেখানে আসিলেন।

জীবানন্দ বলিলেন,—দেবুর মামলার অবস্থার কথা কিছু শুনলে? উকিল কি বলেন?

ইন্দ্র উকিলের সঙ্গে আলোচনার মর্ম তাঁহাকে জানাইল, শুধু শাস্তি সম্বন্ধে উকিলের কথার উল্লেখ করিল না। দেবানন্দের সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টায় কথাও বলিল।

শুনিয়া ত্রিনয়নী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। তারপর উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। জীবানন্দ তাঁহার গমনপথের দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন। তারপর ইন্দ্রের সেবকাশ্রম তল্লাসীর কথা তুলিয়া বলিলেন—যতটা পার তোমাকে সাবধান হয়ে চলতে হবে, বাবা। অনেকের ভালমন্দর ভার রয়েছে তোমার ওপর। আমার শরীরের অবস্থা চোখে দেখছ। ভগবানের ইচ্ছা কি জানিনে। ছোটমেয়েটার বিয়ের কিছুই স্থির করতে পারছিনে।

ইন্দ্র আশ্বাস দিয়া বলিল—এত ভাবনার কি আছে? আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি। তেমন ভাল ছেলের সন্ধান পাইনি বলে আপনাকে জানাইনি।

ইন্দ্র উঠিয়া ভিতরে গেল। ত্রিনয়নীর সঙ্গে দেবানন্দের সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য আশ্বাস দিয়া সে বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিল।

ফটকে কনিষ্ঠ শ্যালক উমানন্দের সঙ্গে দেখা। সে বলিল—আমি যে আপনাদের বাড়ী গিয়েছিলাম জামাইবাবু। দিদি বললে আপনি আমাদের বাড়ীতে এসেছেন।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—আমার খোঁজ কেন আনন্দ?

আনন্দ—দাদা কবে বাড়ী আসবে জামাইবাবু? তাকে কি ছেড়ে দিল না?

ইন্দ্র তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল—দাদা আসবে বইকি আনন্দ, ছাড়া পেলেই আসবে।

পথে চলিতে চলিতে উমানন্দ বলিল—কাল রাতে কি কাণ্ড হয়েছিল জানেন জামাইবাবু?

মুকুন্দ সরকার কি বলিতে যাইতেছিলেন রজনী ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন —আপনাদের রাজনৈতিক কচকচি চলুক, আমরা উঠছি। আশ্রমের কাজ আছে। এসো ইন্দ্র।

জীবানন্দ লক্ষ্মীকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। লক্ষ্মী আসিলে বলিলেন— মা, ইন্দ্রের সেবকাশ্রম তল্লাসীতে আমি বড় ভয় পেয়েছি। আমি বললে ইন্দ্র কিছু মনে করে এই ভেবে বলতে পারিনি, কিন্তু আর না বললে নয়। সেবকাশ্রম বন্ধ করে দিলেই বোধহয় ভাল হয়। নানা জায়গা থেকে ছেলে আসে, তাদের কার মনে কি মতলব আছে কেউ জানে না। এর পরে হয়ত ইন্দ্রকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে। পুলিশের চোখে ও ত একজন দাগী হয়েই আছে। এদিকে গাঁয়েও ওর শত্রু আছে।

লক্ষ্মী মাথা নত করিয়া বলিল—সেবকাশ্রম ওঁর প্রাণ, আশ্রম বন্ধ করলে উনি কি নিয়ে থাকবেন বাবা?

জীবানন্দ উত্তর না দিয়া নিজের মনে ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—সংসারের দিকে চেয়ে ইন্দ্রকে কিছুকাল বাইরের কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হবে, আর কোন উপায় দেখছি না। আর দেরি না করে তোমাকে কথাটা তুলতে হবে ইন্দ্রের কাছে। পারবে না, মা?

লক্ষ্মী তেমনি নতমুখে বলিল—আপনি বলছেন, আমি কথা তুলব।

জীবানন্দ বলিলেন—হাঁ তাই তুলো, মা। আর দেরি করো না।

## ৪

অনেকদিন পরে ইন্দ্র কলিকাতা হইতে রাধারাণীর এক পত্র পাইল।

তাহাকে রাজনগরে আনিবার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সে লিখিয়াছে—ঠাকুরপো, আপনার কথা রাখিতে পারেন নাই। অনেকদিন আপনার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকিয়া শেষে বুঝিলাম আপনি এখানকার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন। রাধারাণী বৌঠান নামে আপনার যে কোন আত্মীয়া আছেন, সে যে আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখিয়া অপেক্ষা করিতে পারে তাহা আপনার মনে নাই। একথা কি সত্য নয়? যাক এ সব কথা। আমি

চাহিয়া বলিলেন—দেবুর কথা ভেবে মন খারাপ করো না, বাবা। সে জেনে শুনে সিংহের গুহায় এগিয়ে গেছে, জীবন্ত ফেরবার আশা রেখে যায়নি।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, তাঁহার স্বর একটু উত্তেজিত শুনাইল,—আমার চিন্তা দেবুকে নিয়ে নয়, আমার চিন্তা তোমাকে নিয়ে। দু দু'টো সংসার তোমার দিকে চেয়ে রয়েছে, নিজেকে বাঁচিয়ে চলতেই হবে তোমাকে।

ইন্দ্র ভাবিল জিজ্ঞাসা করে—কেন নিজেকে বাঁচিয়ে চলব আমি, কিন্তু শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে পারিল না।

জীবানন্দ যেন তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—দেবুর অনুপস্থিতিতে তার নাবালক ভাইবোনের দায়িত্ব যে তোমাকে নিতে হবে বাবা, আমি আর ক'দিন আছি।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্র উঠিল। বলিল—আপনি খবরটা দেবেন ভেতরে, আমি বাড়ী যাচ্ছি।

পথে চলিতে চলিতে সে স্থির করিল লক্ষ্মীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিবে, সেখানেই সে খবরটা শুনিবে।

বাড়ী ফিরিয়া সে লক্ষ্মীকে বলিল—ও বেলা একবার টোল পাড়ায় যেও, তোমার মা ডেকেছেন।

লক্ষ্মী পাঁচু ঠাকুরকে রান্নার ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিল। ইন্দ্রের কথা শুনিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। কি ভাবিয়া পাঁচুকে বিদায় দিয়া সে স্বামীকে বলিল—এদিকে শোন।

ইন্দ্রকে লইয়া সে ঘরে গেল। একটা আসন দেখাইয়া বলিল—বসো। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া লক্ষ্মী তাহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

বলিল—দাদার কি খবর এসেছে বলো।

তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রুর ধারা নামিল। ইন্দ্র তাহার মাথায়, পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল,—সাত বৎসরের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়েছে।

সাত বছর দাদাকে দেখতে পাবো না—লক্ষ্মীর কান্না থামিতে চাহে না।

তল্লাসীর ফলে সেবকাশ্রমের বোর্ডিং হইতে দুইটি ছেলে পলাইয়াছিল, বাড়ী

নিজে সরিয়া থাকিত ? রাধারাণী যে তাহার সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে চাহে তাহা কি ইন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিত না ?

ইন্দ্রের হাসি দেখিয়া রাধারাণী একবার মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল তাহার বুক হইতে। হয়ত তাহার মুখ একটু ম্লান হইল।

লক্ষ্মীকে একান্তে ডাকিয়া রাধারাণী বলিল—তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখবার বড় ইচ্ছে ছিল, সে ইচ্ছে পূর্ণ হল। তোমাকে একটা কথা বলছি, কিছু মনে করো না। ঠাকুরপোকে দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল ওঁর বাইরটা এত সুন্দর কিন্তু মনটা কঠিন। এখানে এসে দেখলাম ওঁর মন কঠিন নয়, কোথায় যেন একটু উদাসীন ভাব রয়েছে ওঁর স্বভাবের মধ্যে। তোমাকে দেখবার, জানবার পর এইটি একটু আশ্চর্য লাগছে। দু'একটা কচি কাচা তোমার কোলে এলে হয়ত এভাব কেটে যাবে।

লক্ষ্মী লজ্জিত মুখে বলিল—আপনি আর ক'টা দিন এখানে থাকুন দিদি।

রাধারাণী বলিল—সে হয় না ভাই। বাবার অসুখ বলে ছুটি পেয়েছি কিন্তু নিজের মেয়েটাকে সঙ্গে আনতে পারিনি। এই থেকে আমার পরাধীন অবস্থা বুঝতে পার। আর একটা কথা বলি বোন। তোমার সুখ সৌভাগ্য দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে ; প্রাণভরা এই আনন্দ নিয়ে আমি যেতে চাই। আমাকে আর বাধা দিয়ো না।

তাহার কথা শুনিয়া লক্ষ্মী যেন একটু বিচলিত হইল। রাধারাণীকে সে আর বাধা দিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল ঠাকুর মানুষকে নিজের মনের সঙ্গে এমন দ্বন্দ্বেও ফেলেন।

রাধারাণী চলিয়া যাইবার চার পাঁচদিন পরে আদিনাথ মাতা ও ভ্রাতাকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিল।

স্থির ছিল তাঁহারা মানদার শ্বশুর রাজেন বাবুর গৃহে উঠিবেন কিন্তু আদিনাথ তাহাতে সম্মত না হইয়া ইন্দ্রের গৃহে তাঁহাদের লইয়া আসিল।

ইন্দ্র সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিল। লক্ষ্মী নিজে বাহিরে আসিয়া শরৎসুন্দরীকে অভ্যর্থনা করিয়া অন্দরে লইয়া গেল।

ছবি বাহির হইয়াছিল। অসামরিক জাতি ও ভীতু বলিয়া বাঙ্গালীর তখনও দুর্নাম। অজ্ঞাতনামা একজন বাঙালীর ছেলে সুদূর ব্রেজিলে গিয়া সৈন্য বিভাগে উচ্চপদ ও খ্যাতি লাভ করিয়াছে হঠাৎ এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়াতে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস বাংলার ছেলেদের "হীরো" হইলেন।

উমানন্দের পিঠে হাত বুলাইয়া ইন্দ্র বলিল—আমাদের কর্ণেল আনন্দ হবে বাংলার সেনাপতি, কি বলো?

অন্দরে শরৎসুন্দরীর সঙ্গে ত্রিনয়নীর আলাপ হইতেছিল।

সরস্বতীর দিকে চাহিয়া শরৎসুন্দরী বলিলেন—লক্ষ্মী মার তুলনা নেই। আপনার ছোট মেয়েটিও সুন্দরী, খুব ভাল করে ঘর বরের খোঁজ দিয়ে এটির বিয়ে দেবেন। বড় বোন রাজার ঘরে পড়েছে, একেও রাজার ঘরে ছাড়া দেবেন না।

ত্রিনয়নী বলিলেল—ওর বিয়ের ভাবনা আমরা আর ভাবি না দিদি, ভেবেই বা কি করব? ইন্দ্র যেখানে মত করবে সেখানেই দেব।

শরৎসুন্দরী—ও মেয়েকে দেখে অনেকে বৌ করতে চাইবে। কোথাও দেখিয়েছেন?

ত্রিনয়নী—অবসর পেলাম কই? বড ছেলের জন্য ভাবনায় আমরা সকলেই কাতর।

দেবানন্দের ইতিহাস শরৎসুন্দরীর অজ্ঞাত ছিল না। শরৎসুন্দরী একটু বিমনা হইলেন। পুত্রস্নেহে যে দেবরকে মানুষ করিয়াছিলেন তাহার কথা মনে পড়িল। সে গ্রেপ্তার হইবার পরে উকিল ভরসা দিল কোন প্রমাণ নাই পুলিশের হাতে, নিশ্চয় ছাড়া পাইবে। হইল পাঁচ বছরের জেল। আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন কিনা কে জানে?

ত্রিনয়নী বলিলেন—বাইরে ইন্দ্রের সঙ্গে বসে কথা বলছে ঐটি বুঝি আপনার বড় ছেলে? শুনেছি খুব ভাল করে পাশ ক'রে কলেজে চাকুরি করছে।

শরৎসুন্দরী—চাকুরি পেয়েছে। উন্নতি হবে শুনি। বাসায় বামুন চাকর নিয়ে থাকে, কিছুদিন আগে ছোট ভাইকে নিয়ে গেছে। কাকাকে বড় ভালবাসত, মনে আঘাত পেয়েছে কাকার জেল হওয়াতে। চাকুরি হয়েছে, বাসা হয়েছে, বলি—বাবা, এবার একটা বিয়ে কর, কে দেখাশুনা যত্ন আত্তি

সমালোচকগণ শাসন সংস্কারকে "দিল্লীকা লাড্ডু", "lollypop", "deformed scheme", "a doll to please children with", "মাকাল ফল" ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করিলেন। রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আর কয়েকজন সভ্য রিফর্মস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিলেন।

ব্রজনাথ বলিল—রিফর্মস কি হবে সেটা এখন চাপা পড়েছে, পৃথক নির্বাচন নিয়ে আন্দোলন চলছে। আমির আলি সাহেব গভর্ণমেণ্টকে খোলাখুলি বলেছেন রাজনৈতিক ব্যাপারে মুসলমানরা হিন্দুদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না। মুসলমানরা শুধু যে পৃথক নির্বাচনের অধিকার চান তা নয়, তাঁদের একদল চাইছেন হিন্দুদের সঙ্গে সমান সংখ্যক আসন।

ইন্দ্র—এটা অন্যায় আবদার। দেশে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে হিন্দুদের সঙ্গে সমান সংখ্যক আসনের দাবিতে রাজি হতেন?

ব্রজনাথ—এই অন্যায় আবদার করবার সাহস হয়েছে গভর্ণমেণ্ট হিন্দুদের অবিশ্বাস করেন বলে। মুসলমান কাগজ স্পষ্ট ভাষায় বলছে—"রাজদ্রোহী হিন্দুদের সঙ্গে রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নাই, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য পৃথক নির্বাচন চাই।

জীবানন্দ—মডারেটরা কি বলেন? রাজেনবাবু "বেঙ্গলীর" ভক্ত, কিন্তু বেঙ্গলী পৃথক নির্বাচনে আপত্তি করছে।

ব্রজনাথ—শুধু আপত্তি করা নয়, বেঙ্গলী স্পষ্ট বলেছে—"The policy of separate electorates will cause a partition not of one province and one community, but of the whole of India."

রাজেনবাবু—বেঙ্গলী একথা বললেও নেতারা শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের দাবি মেনে নেবেন।

জীবানন্দ—এক দেশের অধিবাসীদের মধ্যে কোন একটা সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের দাবির প্রথম কিস্তি এইভাবে মেনে নিলে সে দাবির শেষ কিস্তির বেলায় কি করবেন? আপনি কি বলেন রাজেন বাবু?

রাজেনবাবু—শেষ কিস্তি অর্থে আপনি কি বোঝাতে চান, রায় বাহাদুর? আমার মনে হয় আপনি ব্যাপারটা "রং এঙ্গেল অব ভিশন" থেকে দেখছেন।

হিন্দু মুসলমান দুই ভাই ; হিন্দু জ্যেষ্ঠ, মুসলমান কনিষ্ঠ। ছোট ভাই যদি একটা বায়না করেই বসে বড় ভাইয়ের মনে ভ্রাতৃস্নেহ থাকলে সে কি করবে? মুসলমানরা চাইছে সামান্য কিছু বিশেষ সুবিধে। এই বিশেষ সুবিধেটুকু দিলে এত বড় হিন্দুসমাজের কি ক্ষতি হবে?

ব্রজনাথ—শেষ কিস্তির কথা থাক্, প্রথম কিস্তিতেই দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের দেখাদেখি এংলো-ইণ্ডিয়ানরা, মাদ্রাজের দেশী খৃষ্টানরা, বেলারীর অল-ইণ্ডিয়া বীরশৈবদল পৃথক নির্বাচনের অধিকার দাবি করেছেন। আবার উৎকল বার্তা নামে একখানা কাগজ লিখেছে—"ওড়িয়ারা অনগ্রসর হইলেও রাজভক্ত। মুসলমানদের মত তাহারাও বিশেষ সুবিধা পাইবার অধিকারী। তাহারা বরাবর সরকারের প্রত্যেকটি কাজ সমর্থন করিয়াছে।"

ইন্দ্র—আমি দেখছি ইংরাজ ভারতবর্ষকে এক করতে চায় কিন্তু ভারতবাসীদের এক হতে দিতে চায় না। তাদের পক্ষ থেকে বিভেদ ঘটাবার সকল চেষ্টা সত্বেও ভারতবাসীরা শেষে এক হয়ে যায় এই ভয়ে তারা সেই সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করছে।

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া জীবানন্দ ও ব্রজনাথ তাহার দিকে চাহিল।

ব্রজনাথ বলিল—আপনি খাঁটি সত্যকথা বলেছেন ইন্দ্রবাবু।

তাঁহার কাজ আছে বলিয়া রাজেনবাবু উঠিলেন। তিনি চলিয়া গেলে জীবানন্দ ব্রজনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন—আপনি মাকে নিয়ে ইন্দ্রের ওখানে উঠেছেন এতে রাজেনবাবু খুব চটে গেছেন। কাজটা ভাল হয়নি। আমি অবশ্য বুঝিয়ে বলেছি যে আপনার পৌত্র-পৌত্রী হয়নি, ব্রজনাথবাবুর মা আপনার গৃহে অন্নগ্রহণ করবেন কি করে? আপনি কাল সকালে একবার দেখা করে বুঝিয়ে বলবেন।

ব্রজনাথ সংক্ষেপে বলিল—আচ্ছা।

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পর ত্রিনয়নীর আহ্বানে তাহারা ভিতরে গিয়া জলযোগ করিতে বসিল। মাতার আদেশে সরস্বতী খাবার পরিবেশন করিল। তাহার জড়সড় ভাব দেখিয়া ইন্দ্র তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

তাহারা বিদায় লইবার সময়ে জীবানন্দ বলিলেন—শুনলাম আপনি

আবার তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। নানা স্থানে গোলমাল দেখা দিল। পেশোয়ারে হিন্দুদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল; উপদ্রুত অঞ্চলের হিন্দুরা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার পাইলেন না। বোম্বাইতে দাঙ্গা হইল। বকর-ইদের সময়ে কলিকাতায় গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল। দ্বারবঙ্গে দাঙ্গা হইল, খুলনা ও যশোহরে ব্যাপক ও ভয়ানক দাঙ্গা হইল। এই দাঙ্গার ব্যাপারে সাতাইশ খানা গ্রামে পিটুনী পুলিশ বসিল। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগকে "কাফের, গোলাম ও বুদপরস্ত" বলিয়া ঘোষণা করিয়া পুস্তিকা বিলি হইতে লাগিল। একখানি মুসলমান কাগজ বলিল—"হিন্দুরা মুসলমানের চিরশত্রু। তাহারা স্বরাজ পাইবার জন্য কংগ্রেস চালাইতেছে। স্বরাজ পাইলে তাহারা মুসলমান-দিগকে পায়ের নীচে পিষিবে, গরু কোরবানী ও মসজিদে নমাজ আদায় বন্ধ করিয়া দিবে।"

পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে মুসলমান রাজপুতদিগকে শুদ্ধি করা লইয়া উত্তর ভারতে মুসলমানদের মধ্যে প্রবল হিন্দুবিদ্বেষী আন্দোলন আরম্ভ হইল।

মুসলমানদের মধ্যে এই আন্দোলন লক্ষ্য করিয়া পাঞ্জাব হিন্দুসভা অধি-বেশনের সভাপতি স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "হিন্দু নেশনালিটির" কথা তুলিলেন। মহারাষ্ট্রে "মারাঠা লীগ" নামে নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। মুস্লিম লীগের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ নবীউল্লা খোলাখুলি বলিলেন:

—"There must be complete separation between Hindus and Mussalmans in every matter and every where, whether in public office or District or Local Board; even in a school Hindus and Mussalmans must enter by separate doors."

জাতির দেহে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ক্ষত ছাড়াও অন্য ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল। একখানি নূতন ক্ষত ক্রমে বড় হইতে লাগিল।

এই নূতন ক্ষত আন্দামান।

নূতন ব্যবস্থা অনুসারে আদিনাথ এখন রাত্রে তাহার দিদি মানদার বাড়ীতে খায় ও সেখানে থাকে। আগে সেবকাশ্রমের বাড়ীতে থাকিত ও অন্য ছেলেদের সঙ্গে সেখানে খাইত। রাঘবকে তুষ্ট রাখিবার জন্য ও সেবকাশ্রমের

নিরাপত্তার জন্য রজনী ডাক্তারের পরামর্শে নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছিলেন—তুমি রাত্রে তার বাড়ীতে থাকলে কোন ছলছুতায় তোমাকে বিপদে ফেলতে পারবে না, সেবকাশ্রমের গায়ে আমাদের অজান্তে হাত দিতে পারবে না।

আলোচনার শেষে সকলে চলিয়া গেলে আদিনাথ লাইব্রেরী ঘর ও আরও দুইটি ঘরে তালা দিয়া চাবি নিমাইয়ের হাতে দিল ও লণ্ঠন হাতে রাস্তায় বাহির হইল। নিমাই মণ্ডল সেবকাশ্রমের ভৃত্য ও রাতের প্রহরী।

রাস্তায় চলিতে চলিতে শরৎ পণ্ডিতের কথকতার কথা আদিনাথের মনে হইল। পণ্ডিত বলিলেন—প্রতি কল্পে রাম ও রাবণ রাক্ষসের জন্ম হইবে। যজ্ঞভূমিজাতা সীতাকে লইয়া প্রতিকল্পে উভয়ের যুদ্ধ হইবে—

এবং রাম সহস্রানি, রাবণং সহস্রশঃ ভূতানি, ভবিত্যব্যানি।

রাবণের মত কূটনীতিজ্ঞ সেনাপতি পরিচালিত পরাক্রান্ত বিজাতীয় অর্থাৎ বিদেশী, রাক্ষস সদৃশ হিংস্র জাতি পুনঃপুনঃ যজ্ঞভূমিজাতা অর্থাৎ যজ্ঞ ভূমির মত পবিত্র—যে ভূমিতে অদ্যাপি দেবাঃ ইচ্ছন্তি জন্ম—সেই পবিত্র ভারতভূমি আক্রমণ করিতে—

রাত্রে গ্রাম্যপথ একেবারে নির্জন হইয়া গিয়াছে। পথের দুই পাশে নীচু ঝোপঝাড় নিস্তব্ধ, বাঁশের ঝাড়গুলির মধ্যে বহু বাদুড় নিঃশব্দে ঝুলিতেছে। নিজের মনে চিন্তা করিতে করিতে আদিনাথ করণ পুকুর পাশে রাখিয়া রাজেন বাবুর বাড়ীর পথ ধরিতে পিছন হইতে কে ডাকিল—

—কে যায় লণ্ঠন হাতে? একটু দাঁড়াও না বাপু।

হঠাৎ ডাক শুনিয়া আদিনাথ চমকিয়া উঠিল। যে ডাকিয়াছিল সে দ্রুতপদে আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইতে আদিনাথ দেখিল তাহার দিদির খুড়তুত ননদ জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা নূতন রাজনগরে আসিয়াছে। আদিনাথ শুনিয়াছে বিবাহের বছর তিনেক পরে বিধবা হইয়া জ্ঞানদা শ্বশুর বাড়ীতেই ছিল। কিন্তু বছর না ঘুরিতে শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাহাকে অপবাদ দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহার পিতা ইতিমধ্যে মারা গিয়াছিলেন। অন্য আশ্রয় না থাকায় সে জ্যেঠা

রাজেন বাবুর কাছে আসিয়াছে। এখানে আসিবার কিছু দিনের মধ্যে সে নানা কৌশলে রাজেন বাবু ও রাঘবকে হাত করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সে তাহার দিদির কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে একজন, তাহাকে ভয় করিয়া চলিতে হয়। আদিনাথ লক্ষ্য করিয়াছে তাহার উপর জ্ঞানদা একটু বেশী সদয়।

তাহাকে দেখিয়া আদিনাথ বলিল—এই আঁধার রাতে বিনা আলোতে কোথায় গিয়েছিলেন?

জ্ঞানদা—গিয়েছিলাম কথকতা শুনতে। রামোঃ! এই কথকতা শুনতে নাকি মানুষ যায়। রাধাকৃষ্ণের কথা নয়, প্রহ্লাদের চরিত্র নয়, রাম রাবণের যুদ্ধ! আর কথকঠাকুরের গানেরই বা কি ছিরি! কেন বাপু, আমাদের পুরনো গানে কি দোষ হয়েছে?

কদম তলায় বাজে বাঁশী
শুনে আমার প্রাণ উদাসী

গান শুনে চোখে জল আসবে তবে না বলি কথকতা।

আদিনাথ কোন কথা না বলিয়া লণ্ঠন হাতে চলিতে আরম্ভ করিল।

জ্ঞানদা বলিল—বড় যে হন হন করে চললে? একটু আস্তে চলো না বাপু। ভয় নেই, ঘাড় মটকাবো না।

আদিনাথ বলিল—বড় ঘুম পেয়েছে। আপনি পা চালিয়ে আসুন।

আদিনাথ তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। জ্ঞানদা আর কোন কথা না বলিয়া তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু মনে মনে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল আদিনাথের এই ঔদাসীন্যে। মতলব আঁটিয়া সে করণ পুকুরের ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল আদিনাথের জন্য। ক্রুদ্ধ হইয়া সে মনে মনে বলিল—তোমার এই অচ্ছেদ্দার শোধ তুলব তোমার বোনের ওপর, তখন দেখো।

পরদিন আদিনাথ ইন্দ্রকে বলিল—দাদা, মাষ্টার মশায়ের বাড়ী আর থাকা চলবে না আমার।

ইন্দ্র বলিল—কি ব্যাপার আদি?

ঘরের চারিদিকে চাহিয়া লইয়া নিম্নস্বরে সে জানাইল যে রাজেনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী জ্ঞানদা তাহার পিছনে লাগিয়াছে। তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল নয়

এই যে রাজেনবাবু জীবানন্দের কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি আদিনাথ ও তাহার ভগ্নীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিলেন। বলিলেন আদিনাথ একজন গুণ্ডা প্রকৃতির অসচ্চরিত্র যুবক। সে তাঁহার বিধবা, অল্পবয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ফুসলাইয়া কুপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার ভগ্নী এ বিষয়ে তাহার সাহায্যকারী। রাঘব বাড়ী আসিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাঘবকে গোপনে আদিনাথ ও তাহার ভগ্নীর কথা জানাইয়াছে, লজ্জাবশতঃ তাঁহাকে কোন কথা জানায় নাই। রাঘব এ সম্বন্ধে তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অপরাধ অস্বীকার করিয়া জ্ঞানদার চরিত্রে দোষারোপ করিতে থাকে। ভগ্নীর চরিত্রে দোষারোপ করাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাঘব স্ত্রীকে দুই চারিটা কটু কথা বলিতে সে ভয়ে পলাইয়া ইন্দ্রের বাড়ীতে চলিয়া যায়। উঠিবার আগে রাজেনবাবু বলিলেন আমি ইন্দ্রকে স্নেহ করি। সে ভিতরের ব্যাপার জানেনা। আর আমিও পারিবারিক কেলেঙ্কারীর কথা বাহিরে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। ইন্দ্রকে বলিবেন সে বৌমাকে যেন পাঠাইয়া দেয়, আর ঐ আদিনাথ ছোকরাটিকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেয়। সে অতি দুষ্ট চরিত্রের লোক, শুধু স্বদেশীর ভড়ং করে।

ইন্দ্র তাহার শিক্ষক রাজেন বাবুর অভিযোগ শুনিয়া বুঝিতে পারিল এ সমস্ত রাঘবের রচিত কথা। সে পিতাকে যাহা বুঝাইয়াছে পুত্র স্নেহে অন্ধ বৃদ্ধ তাহাই বুঝিয়াছেন।

সে শ্বশুরকে বলিল—মাষ্টার মশায়কে রাঘব বাবু যা বলেছেন তিনি তাই বিশ্বাস করেছেন। তাঁর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে যা হোক, আমি মাষ্টার মশায়ের পুত্রবধূকে পাঠিয়ে দিতাম কিন্তু রাঘব বাবু তাঁকে এমন অমানুষিক প্রহার করেছেন যে জ্বরে ও গায়ের ব্যথায় তিনি তিন দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। রজনী ডাক্তার মশায় দেখছেন। শুনলাম আজ জ্বর ছেড়েছে। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁকে পাঠাবার চেষ্টা করব।

জীবানন্দ বলিলেন—হাঁ বাবা, তাই করো। এ গোলমাল মিটিয়ে ফেলা ভাল। রাঘব লোক ভাল নয়।

ইন্দ্র বলিল—আমি পাঠাবার চেষ্টা করব কিন্তু তিনি যদি ও বাড়ী যেতে অনিচ্ছুক হন আমি জোর করে পাঠাতে পারব না।

জীবানন্দ—কিন্তু—

ইন্দ্র—আদিনাথকে সঙ্গে দিয়ে আমি ওঁকে ওঁর মার কাছে পাঠিয়ে দেব। তারপর দু'পক্ষের যা করবার হয় তাঁরা করবেন।

ইন্দ্রের প্রস্তাব শুনিয়া জীবানন্দ আশ্বস্থ বোধ করিলেন। বলিলেন—এ দিকটা আমি ভাবিনি ইন্দ্র, আমার মনে হয়নি। রাঘব বড় খারাপ লোক বাবা, গাঁয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছে, তাই ভয় পেয়েছিলাম।

দিন কয়েক পরের কথা।

মানদার জ্বর বন্ধ হইয়াছে, তাহাকে ভাত দেওয়া হইয়াছে। আদিনাথকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্র বিকালের দিকে জলযোগের জন্য অন্দরে আসিলে লক্ষ্মী বলিল—মানদা দিদিকে রাজী করাতে পারলাম না। আজ সারা দুপুর চিনি ও আমি তাঁকে নানাভাবে বোঝালাম। চিনি নিজের অবস্থার কথা বলে তাঁকে কত বোঝাল মেয়েদের শ্বশুর ঘর ছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই। মানদা দিদি সব শুনে মাথা নেড়ে বললেন,—ও ছোটলোক কসাইয়ের ঘরে আমি আর যাব না। মা আছেন, ভাইরা আছে, তারা দু'টো খেতে দেয় ভাল, নইলে ভিক্ষে করে খাব, দাসীবৃত্তি করব। আমার কাছে সে ও ভাল।

—চিনি তবু তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করল। তার কথা শুনে মানদা দিদি হেসে বললেন—তোমরা এত ভাবছ কেন ভাই আমি বুঝি না। সংসারে আমার সাধ আহ্লাদ সব শেষ হয়েছে, সংসারে ঘেন্না ধরেছে। আমার বাবার গোবিন্দজীকে তোমরা দেখনি। কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম গোবিন্দজী আমাকে ডাকছেন। দেখলাম মানুষ যেমন করে হাতছানি দেয় ঠিক তেমনি করে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। জেগে উঠে আমার মত তখনি ঠিক করে ফেললাম।

লক্ষ্মীর মুখে মানদার কথা শুনিয়া ইন্দ্রের মনে হইল সংসার সমুদ্রে যাহাদের নৌকাডুবি হইয়াছে তাহাদের একমাত্র আশ্রয় বুঝি এই নবদূর্বাদলশ্যাম কিশোর ঠাকুর। সে বুঝিল মানদাকে আর বুঝাইবার চেষ্টা করা বাহুল্য।

দিন তিনেক পরে রাজনগরে ইন্দ্রের সমালোচক মণ্ডলী ও প্রবল প্রতাপ রাঘব দারোগা শুনিয়া বিমূঢ় হইল আদিনাথ তাহার ভগ্নীকে লইয়া তারাপুরে চলিয়া গিয়াছে।

ইন্দ্র হিসাব করিয়া এই সংবাদ এমন সময় প্রচার করিল যখন পতিসরা ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া মহিষের গাড়ী ভাদুই নদী নৌকায় পার হইয়া তারাপুরের রাস্তায় পড়িয়াছে। দৌড়াইয়া গিয়া চুলের মুঠি ধরিয়া মানদাকে ঘরে ফিরাইয়া আনা রাঘবের পক্ষে তখন আর সম্ভব নহে।

আদিনাথ যাইবার সময়ে সেবকাশ্রমের কাজের ভার ইন্দ্রকে বুঝাইয়া দিয়া গেল। ইন্দ্র বুঝিল সে আর ফিরিবে না। বুঝিলেও সে কোন প্রশ্ন করিল না, অন্যান্য বারের মত আদিনাথকে ফিরিবার অনুরোধ করিল না। মানদার ব্যাপারের পরে রাজনগরের হাওয়া এমন প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছিল যে আদিনাথের পক্ষে শান্তিতে কাজ করা সম্ভব ছিল না।

আদিনাথ যখন উদ্‌ভ্রান্ত, অস্থির মন লইয়া তাহার কাছে প্রথম আসিয়াছিল ইন্দ্রের বুঝিতে দেরি হয় নাই যে উপযুক্ত অন্য কর্ম্মক্ষেত্র না পাইলে সে বিপ্লবী পন্থা ধরিবে। সেবকাশ্রমের উদ্দেশ্য ও কাজের প্রণালীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া আদিনাথের হাতে সে আশ্রম চালাইবার ভার তুলিয়া দিয়াছিল। পুলিশের উৎপীড়নে, লোকের নির্বোধ বিরোধিতায় কাজ বার বার ব্যাহত হইলেও সে ছাড়ে নাই, যেমন করিয়া হউক সে কাজ চালাইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাকে আর ধরিয়া রাখা গেল না।

আদিনাথ চলিয়া যাওয়াতে ইন্দ্র মুষড়িয়া পড়িল। দেশের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাহার বিমর্ষভাব আরও যেন বাড়িল। কোনদিকে একটু আশার আলোক তাহার চোখে পড়ে না এমন অবস্থা দেশের।

মর্লে-মিণ্টো রিফর্মস দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হাঙ্গামার বন্যা আনিয়াছে। পুলিশের হাতে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; তাহাদের উৎপীড়নে দেশের লোক সন্ত্রস্ত, উৎকণ্ঠিত। কংগ্রেস দলীয় বিবাদের জের টানিতেছে। কারারুদ্ধ বালগঙ্গাধর তিলকের কণ্ঠ নীরব। একসট্রিমিষ্ট বাংলার নেতা অরবিন্দ ঘোষ নিরুদ্দেশ। যুগান্তর, বন্দে-মাতরমের বাণী স্তবধ, বিপিনচন্দ্র পাল আধ্যাত্মিকতা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

দেশে প্রকাশ্য আন্দোলনের আড়ালে যে গুপ্ত আন্দোলনের ধারা বহিতেছিল গভর্ণমেণ্ট তাহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় ঢাকার অনুশীলন সমিতিভুক্ত পঞ্চান্নজন আসামীকে

বঙ্গ-ভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায় দাবি করিলেন সকল শ্রেণীর চাকুরির অর্ধেক তাঁহাদিগকে দিতে হইবে, শিক্ষার খাতে সমগ্র ব্যয়ের অর্ধেক তাঁহাদের জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে, আইনসভা, জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সভ্যদের শতকরা ৫০টি আসন তাঁহাদিগকে দিতে হইবে।

বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিহার ও উড়িষ্যাকে পৃথক প্রদেশরূপে ঘোষণা করিয়া গভর্ণমেণ্ট জানাইলেন "Administrative Purpose"এ বাংলার যে সকল জেলা বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বাংলাকে সেগুলি ফিরাইয়া দিবার কথা পরে বিবেচনা করা হইবে।

কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল।

অনেক চেষ্টায় বিমর্ষভাব ও নিশ্চেষ্টতা কাটাইয়া ইন্দ্র আবার নূতন উদ্যমে সেবকাশ্রমের কাজ আরম্ভ করিল। কর্মব্যস্ত স্বামীর দিকে চাহিয়া লক্ষ্মী একটু নিশ্চিন্ত বোধ করিল।

কিন্তু বেশীদিন এই নিশ্চিন্তভাব থাকিল না।

হঠাৎ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের একখানি নোটিশ ইন্দ্রের হস্তগত হইল। আপত্তিজনক কার্যে নিযুক্ত আছে এই হেতুতে রাজনগরের সেবকাশ্রম নামক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া যাইতেছে, অবিলম্বে এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিতে হইবে।

নোটিশ পাইয়া ইন্দ্র বসিয়া পড়িল। আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া যে সেবকাশ্রম সে চালাইয়া আসিয়াছে, যাহার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে অযথা, অন্যায় করিয়া এইভাবে তাহা ধ্বংস করা হইল। নোটিশ পাঠাইবার আগে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ডাকিয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করা পর্যন্ত আবশ্যক মনে করিলেন না। সেবকাশ্রমের বাড়ীতে তালা লাগাইতে হইল।

সেবকাশ্রমের বাড়ীতে তালা লাগাইয়া ইন্দ্র ভাবিল রাজনগর ছাড়িয়া এইবার

বাহিরে কিছুদিন কাটাইয়া আসিবে, রাজনগরে আর ভাল লাগিতেছিল না। এ বিষয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে পরামর্শ করিবে ভাবিতেছে এমন সময় কলিকাতা হইতে ব্রজনাথের একখানি পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে—আদির কোন খবর পাইয়াছেন কি আপনি? মা ও মানদাকে এখানে রাখিয়া তারাপুরে ফিরিয়া যাইবার পর হইতে তাহার আর কোন খবর পাই নাই আমরা। মা আর কলিকাতা থাকিতে চাহিতেছেন না, তারাপুরে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। মা ও মানদাকে লইয়া কয়েকদিনের মধ্যে আমি তারাপুরে যাইতেছি। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু যাইতেছেন, অভিপ্রায় আমাদের দেশ দেখিবেন। তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রিওয়ালা পণ্ডিত লোক, আপনার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম। আশা করিতেছি আপনি কোন সময়ে কলিকাতা আসিলে সে সুযোগ হইবে।

ইন্দ্র লক্ষ্মীকে ব্রজনাথের চিঠি দেখাইল।

চিঠি পড়িয়া লক্ষ্মী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর সাগ্রহে বলিল—ব্রজবাবুকে লিখবে তাঁর বন্ধুকে নিয়ে রাজনগরে দু'একদিন বেড়িয়ে যেতে?

প্রস্তাব শুনিয়া ইন্দ্র একবার লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিল তাহার মনের ভাব বুঝিবার জন্য। একটু হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, আমি আজই লিখছি ব্রজবাবুকে।

স্বামীর নিঃসঙ্গতা দূর করিবার একটা উপায় পাওয়া গেল ভাবিয়া লক্ষ্মী একটু খুশীমনে অন্দরে গেল।

ব্রজনাথকে চিঠি লিখিবার জন্য ইন্দ্র নিজের ঘরের দিকে চলিল। সে ভাবিল তাহার নিঃসঙ্গতা দূর করিবার জন্য, তাহাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য লক্ষ্মীর চেষ্টার অন্ত নাই, কিন্তু তাহার মনের শূন্যতা কি সহজে দূর হইবে?

ব্রজনাথ ও তাহার বন্ধুকে সাদর নিমন্ত্রণ জানাইয়া ইন্দ্রের পত্র সেই দিনই ডাকে রওনা হইয়া গেল।

দিন দশ পরে ব্রজনাথ ও তাহার বন্ধু তারাপুর হইতে রাজনগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ইন্দ্র পরম সমাদরে উভয়কে অভ্যর্থনা করিল।

ব্রজনাথ বন্ধুর পরিচয় দিয়া বলিল—ইনি বীরেন্দ্র দেব, কলেজের অধ্যাপক। কলিকাতা ইউনিভারসিটির ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র, প্যারিস ও বার্লিন ইউনিভারসিটির

আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারবে না। কিন্তু তাঁদের সকল আবেদন নিবেদন ও ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ব্রিটেন নিরপেক্ষ রইল।

—তখন হতাশ ও ক্রুদ্ধ এদেশের মুসলমান নেতাদের মধ্যে হিন্দুদের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম জেগে উঠল। স্মরণ শক্তির দুর্বলতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ হিন্দুরা এই ভ্রাতৃপ্রেমের আবেদনে সাড়া দিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করলেন না। পৃথক নির্বাচন দাবি করবার সময়ে মুসলমান নেতাদের হিন্দু-বিদ্বেষী উক্তি, পেশোয়ার, বোম্বাই, ত্রিহুত, কলিকাতার দাঙ্গার কথা, আফজল খাঁ ও বিন কাশেম উৎসবের কথা হিন্দুদের মন থেকে মুছে গেল।

—ফেডারেশন হলের মাঠের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সভায় ইটালীয়ান জিনিস বয়কট করবার প্রস্তাব করা হল। রেড ক্রেসেণ্ট সোসাইটিকে অর্থ সাহায্য করবার জন্য হিন্দু কাগজগুলি আবেদন করল। ভ্রাতৃপ্রেমের আবেগে বেঙ্গলী লিখল—"আমরা আশা করছি এই যুদ্ধের ফলে প্যান-ইসলামিক আন্দোলন আরও প্রবল হবে।" প্যান-ইসলামিক আন্দোলন প্রবল হলে তাতে হিন্দুদের আহ্লাদিত হবার হেতু আছে কিনা সেটুকু বোঝবার মত রাজনৈতিক বুদ্ধি তখনও হিন্দুদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেনি।

—শুধু অর্থ সাহায্য করা নয় হিন্দু নেতা তাহেরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর ত্রিপোলীতে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক পাঠাবার প্রস্তাব করলেন।

—আজকের এই বলকান যুদ্ধের সময়েও সেই পুরনো প্রহসনের নূতন অভিনয় হচ্ছে। সেদিন শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলেজ স্কোয়ারে এক সভায় য়ুরোপীয় জিনিস বয়কট ও হিন্দু মুসলমানের একতা ঘোষণা করে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। নাখোদা মসজিদের ইমাম সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বললেন—"হিন্দুরা মুসলমানদের ভাই, বন্ধু ও অবলম্বন। হিন্দুরা ইসলামের বিপদের সময়ে সাহায্য করেছেন, মুসলমানদের কর্ত্তব্য তাঁহাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।"

বীরেন্দ্র হাসিয়া বলিল—এছাড়া হিন্দুদের মনে লাগে এমন প্রচার কার্যও তাঁরা সুরু করেছেন। য়ুরোপ দিনের পর দিন এশিয়া গ্রাস করছে এই কথা তুলে "হাবলুল মাতিন" নামে ফার্সী ভাষার কাগজখানা পৃথিবীর সকল অশ্বেত জাতিকে য়ুরোপের শ্বেত জাতিগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার জন্য

একজন ঝি ঘরে ঢুকিয়া মেঝেতে জল ছিটাইয়া হাত দিয়া মুছিয়া লইল। তারপর তিনখানি আসন পাতিয়া তিনগ্লাস জল রাখিয়া চলিয়া গেল। তিনখানি পাথরের রেকাবে নানা রকম খাবার সাজাইয়া সরস্বতী ও আনন্দ ঘরে আসিল।

আয়োজন দেখিয়া বীরেন্দ্র বলিল—সকালে ইন্দ্রবাবুর গৃহিণী যে আয়োজন করেছিলেন তার ওপর এই নূতন আয়োজন আমাদের কলকাতার পেটে বিপ্লব ঘটাবে।

জীবানন্দ বলিলেন—ঘরে তৈরী সামান্য জিনিস। বসুন আপনারা।

উমানন্দ সিঁড়ির পাশে ভিতরের দিকের ঘরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—আচ্ছা ছোড়দি, কলকতার পেটে বিপ্লব ঘটাবে মানে কি? কলকাতা ত একটা জায়গা, তার আবার পেট আছে না কি?

জলযোগ শেষ করিয়া বীরেন্দ্র, ব্রজনাথ ও ইন্দ্র বিদায় লইল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া সরস্বতী বলিল—চুপ, চুপ, ওঁরা শুনতে পাবেন।

পরের দিন ব্রজনাথ ও বীরেন্দ্র কলিকাতা ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় ব্রজনাথ বলিল—ইন্দ্রবাবু, এবার আপনি কয়েকদিনের জন্য কলকাতা আসুন; অবশ্য সস্ত্রীক। আমার বাড়ীতে এখন আমি ও আমার ছোটভাই সোমনাথ ছাড়া আর কেউ নেই। যথেষ্ট জায়গা আছে, কোন অসুবিধে হবে না আপনাদের। বলুন কবে যাবেন?

বীরেন্দ্র ব্রজনাথের সঙ্গে যোগ দিয়া বলিল—দিন কয়েক জমিদারী চাকুরি থেকে ছুটি নিন না ইন্দ্রবাবু। কলকাতায় তিনজন মিলে নিশ্চিন্তে আড্ডা জমানো যাবে।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—যাবার ত ইচ্ছে আছে খুব, হয়ে উঠছে না। আপনাদের সঙ্গ আকাঙ্খার বিষয়। দেখি কত শীঘ্র ব্যবস্থা করতে পারি।

শরৎসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—তার আগেই তোকে চিঠি লিখব নিয়ে যাবার জন্য।

ব্রজনাথ চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে তাঁহার গোপন অভিপ্রায় প্রকাশ পাইল।

মানদা নিজেও তাঁহার এই অভিপ্রায় সম্বন্ধে আগে হইতে কিছুমাত্র আভাস পায় নাই। যখন তিনি নিজে একবার রাজনগরে গিয়া মানদার শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তখন সে ইহার প্রথম আভাস পাইল। কয়েকদিন পরে তিনি মানদাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মানদা দৃঢ়ভাবে জবাব দিল—ও ঘরে আমি আর ফিরব না।

শরৎসুন্দরী নানা রকমে বুঝাইয়া মেয়েকে রাজী করাইবার চেষ্টা করিলেন। সে যখন কোনমতে রাজী হইল না অবিশ্রান্ত গালিগালাজ ও কটু ভর্ৎসনায় তিনি তাহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। স্বামীর ঘরে যাইতে চাহে না এমন মেয়েকে পেটে ধরিাছিলেন বলিয়া মানদাকে শুনাইয়া নিজের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে মেয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ করিতেন, বাজে ছুতায় অনশন করিতেন। কিছুদিন এইভাবে চলিবার পরে মানদার কাছে জীবন অসহ্য হইয়া উঠিল। কোন দিকে কুল না পাইয়া অবশেষে সে হাল ছাড়িয়া দিল। ভাবিল নিজের মা যখন এত অবুঝ, পেটের মেয়ের উপর এমন নিষ্ঠুর, সে আর কি করিবে? রওনা হইবার সময়ে গোবিন্দজীকে প্রণাম করিয়া বলিল—আমার ভার কি তুমি আর বইতে পারছ না ঠাকুর যে এমন করে ঠেলে ফেললে? আর যেন এখানে ফিরতে না হয় তাই ক'রো ঠাকুর।

মাতার এত ভর্ৎসনার একটি জবাব দেয় নাই মানদা। গোবিন্দজীকে প্রণাম করিয়া সে নীরবে রওনা হইল মাতার সঙ্গে। রাজনগরে শ্বশুরের গৃহে তাহাকে রাখিয়া, তাহার শ্বশুরের কাছে চোখের জল ফেলিয়া, অজ্ঞান পুত্রবধুর অপরাধ ভুলিয়া তাহাকে পায়ে স্থান দিবার জন্য কান্নাকাটি করিয়া তিনি যখন বিদায় লইলেন মানদা নীরবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় দিল।

সে অগ্রসর হইয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইল, বলিল—রজনী ডাক্তারবাবু এসেছেন। তাঁকে আমি আমি নিয়ে আসছি কি অসুখ হয়েছে দেখাবার জন্য।

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, তাহার সই উঠিতে দিলেন না। ঘোমটার মধ্য হইতে তিনি নিম্নস্বরে মুকীর মাকে, অর্থাৎ মুকীর মাকে আড়াল দিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন,—মুকীর মা, বাবুকে বল এখন বদ্যি ডাকতে হবে না, সময় হলে ধাই ডাকতে হবে। আর বদ্যি দেখাবার টাকা দিয়ে মেঠাই আনিয়ে দিন আমাদের, আমরা অসুখ ধরেছি, চিকিচ্ছে করছি।

খবর শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের মনে নূতন একটা ভাবের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। সে ভাবিল তাই লক্ষ্মীর এত লুকাচুরি, মেয়ের অসুখে শ্বশুর-শাশুড়ীর ঔদাসীন্য। মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া ইন্দ্র বলিল—মেঠাই আনতে লোক পাঠাচ্ছি, আপনি যাবেন না।

কামিনী বৌ লক্ষ্মীর গা টিপিলেন। হাসি চাপিয়া বলিলেন—মুকীর মা, বাবুকে বল কাল মেঠাই খাব, আজ রাত হয়েছে বাড়ী যাই।

লক্ষ্মীর সইয়ের কথায় ইন্দ্রের একটু লজ্জা হইল। সে বলিল—আচ্ছা।

তারপর তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

কামিনী বৌ বলিল—দেখলি সই, অসুখ ধরা পড়ায় কর্তা আহ্লাদে গলে গেলেন। এবার বাড়ী যাই ভাই। মুকীর মা, কাউকে ডাক, লণ্ঠন ধরে বাড়ী পৌঁছে দেবে আমাকে।

লক্ষ্মী ছাড়িল না। কামিনী বৌকে সন্ধ্যাবেলা এক পেট মিষ্টি খাইয়া ছেলেমেয়ের জন্য এক সরা মিষ্টি লইয়া যাইতে হইল।

ইতিমধ্যে রাজনগরে এমন এক ব্যাপার ঘটিল যাহার অনুরূপ ঘটনা পূর্বে আর ঘটিয়াছে বলিয়া কাহারও মনে পড়ে না।

মানদা আসিবার মাসখানেক পরে একদিন সকালের দিকে হঠাৎ রাজেনবাবু পাগলের মত জীবানন্দের কাছে আসিলেন। জীবানন্দকে তিনি যাহা বলিলেন গ্রামে আগেই তাহা প্রচার হইয়াছিল। কাল রাত্র হইতে মানদাকে পাওয়া যাইতেছে না। সেই সঙ্গে রাজেনবাবুর শয়ন ঘরে ট্রাঙ্কের মধ্যে নগদ

টাকাকড়ি, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূর যে সকল অলঙ্কার ছিল তাহাও পাওয়া যাইতেছে না।

ঘটনার বিবরণ শেষ করিয়া রাজেনবাবু বলিলেন,—বাপ মা মরা ভাইঝি শ্বশুরবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে আশ্রয় দিয়েছিলাম। ওর কথায় বিশ্বাস করে বৌমার কত লাঞ্ছনা করেছি। কাল সাপ পুষেছিলাম দুধ দিয়ে, জাত
কাল সাপ। আমার সর্বস্ব চুরি করে কুলে কালি দিয়ে পালাল। ১৬

কাহার সঙ্গে জ্ঞানদা পালাইয়াছ তিনি বলিতে পারিলেন না। এ সম্বন্ধে গ্রামে নানা গুজব রটিল।

জ্ঞানদার গৃহ ত্যাগ রাজনগরের সমাজের উপর একটা বড় আঘাত বলিয়া গ্রামের লোকে গ্রহণ করিল। এতদিন পরে সকলের মনে পড়িল রাজেনবাবু রাজনগরের লোক নহেন, তিনি বিদেশী। লোকে তাঁহাকে বর্জন করিয়া চলিতে লাগিল।

লক্ষ্মীর শরীর ক্রমে খারাপ হইয়া পড়িতেছিল।

রজনী ডাক্তারের ঔষধ, টোটকা-টাটকায় ফল দিল না, রক্তশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিল। ত্রিনয়নী ও জীবানন্দ উদ্বিগ্ন হইলেন।

চিন্ময়ীকে কয়েকদিনের জন্য রাজনগরে পাঠাইবার অনুরোধ জানাইয়া ইন্দ্র পত্র সহ নায়েবকে তাহার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইল। শাশুড়ী সদয় হইয়া অনুমতি দেওয়াতে চতুর্থ দিনে চিন্ময়ী আসিয়া পৌঁছিল।

লক্ষ্মীর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া সে বলিল—দাদা, কলকাতা নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখান। রজনী ডাক্তার মশায়ের ভরসায় ওকে এখানে আর রাখবেন না।

রজনী ডাক্তার নিজেও কলিকাতা লইয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন।

ইন্দ্র জীবানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কলিকাতা যাওয়া স্থির করিল। প্রথমে তাহার রাধারাণী বৌ ঠাকরুণের কথা ভাবিয়া থাকিবার ব্যবস্থার জন্য দেবনাথকে চিঠি লিখিবে মনে করিয়াছিল। লক্ষ্মীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করিয়া মত পরিবর্তন করিয়া ব্রজনাথকে চিঠি লিখিল তাহার বাড়ীর কাছে একখানি ভাল বাড়ী দেখিয়া ভাড়া করিবার জন্য। চিন্ময়ীর শ্বশুরবাড়ীতে

সঙ্গে বাঘবন্দী, গোলকধাম খেলে, স্কুলের কথা, পড়াশোনার কথা হয়। সরস্বতীর কাছে সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহার দাদা দেবানন্দের কথা, ইন্দ্রের সেবকাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করে। সরস্বতীর উত্তর সন্তোষজনক মনে না হইলে লক্ষ্মীর কাছে জিজ্ঞাসা করে। সরস্বতীকে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, ওয়াশিংটনের গল্প, রাণা প্রতাপ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্যের গল্প শোনায়, পাড়ার লাইব্রেরী হইতে তাহাকে গল্পের বই আনিয়া দেয়।

একদিন একটা ইংরাজি কথার উচ্চারণ লইয়া সোমনাথের সঙ্গে সরস্বতীর তর্ক বাধিল।

তর্কের মুখে সোমনাথ বলিল—তুমি ইংরাজি bla ব্লে, ble ব্লি পর্যন্ত জানো, তবু আমার সঙ্গে তর্ক করছ? স্কুলে ভর্তি হও না কেন?

সরস্বতীর ইংরাজী বিদ্যা বাস্তবিক ফার্ষ্ট বুকের বেশী অগ্রসর হয় নাই। সমবয়সী সোমনাথের কথায় সে মনে আঘাত পাইল। সুযোগ বুঝিয়া সে ইন্দ্রের কাছে স্কুলে ভর্তি হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—কত দিন এখানে থাকবে যে স্কুলে ভর্তি হতে চাও?

সরস্বতীকে মুখে একথা বলিলেও সে পাড়ার এক বালিকা বিদ্যালয়ে তাহাকে ভর্তি করিয়া দিল; ভাবিল যে কয়দিন পারে পড়ুক।

## ৯

লক্ষ্মীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া নূতন বাড়ীতে গুছাইয়া বসিবার পরে ইন্দ্র একটু অবসর পাইল।

সন্ধ্যাবেলা ব্রজনাথ আসিলে সে বলিল—বীরেন্দ্র বাবুর খবর কি? চলুন, তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা করে আসি।

ব্রজনাথ—তিনি কলিকাতার বাইরে গেছেন কয়েকদিনের জন্য, দু'তিন দিনের মধ্যে ফেরবার কথা। এখানে থাকলে নিজেই আসতেন। আপনি এখানে আসছেন তিনি জানেন।

ইন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল বাড়ীর ভিতরে যাইবার দরজার আড়ালে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। সে উঠিয়া সে দিকে যাইতে দেখিল সোমনাথ তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতেছে।

সোমনাথকে ডাকিয়া সে বলিল—ওপরে গিয়ে তোমার সরীদি'কে একটু ডেকে দাও ত সোমনাথ।

সরস্বতী আসিতে তাহাকে কি বলিয়া ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বসিল। ব্রজনাথ বলিল—ডাক্তারের চিকিৎসায় ফল কিছু বুঝতে পারছেন?

ইন্দ্র—মনে হয় কিছু উন্নতি হয়েছে। ভাবছি উনি যে সময় চেয়েছেন সে সময় পর্যন্ত দেখব কতদূর ফল হয়। মুস্কিল হয়েছে আমাদের দুই বাড়ীতে গৃহিণী গোছের কেউ না থাকাতে। আপনার বাড়ী ত নারী বর্জিত।

ব্রজনাথ হাসিয়া বলিল—সোমনাথ তাই আপনার বাড়ীতে বেশী সময় কাটায়। মা না থাকতে ওর অসুবিধে হয়েছিল বেশী।

সরস্বতী একটু সঙ্কুচিত ভাবে ঘরে ঢুকিল একখানি রেকাবীতে কয়েকটি মিষ্টি লইয়া, পিছনে জলের গ্লাস হাতে মদন।

ইন্দ্র বলিল—এখানে আসন নেই, টিপয়ও নেই, ব্রজবাবুর হাতে দাও।

সরস্বতী রেকাবী হাতে আগাইতে ব্রজনাথ একটু বিব্রতভাবে উঠিয়া একটি মিষ্টি তুলিয়া লইল। বলিল—আমি খেয়ে এসেছি, এখন এত মিষ্টি খেতে পারব না। এগুলো নিয়ে যান।

সরস্বতী ইন্দ্রের দিকে চাহিয়া মিষ্টির থালাটি তাহার হাতে দিতে গেল। ইন্দ্র হাসিয়া বলিল—ব্রজবাবু খেলেন না, তার শাস্তি আমাকে কেন? ওটা মদনের হাতে দিয়ে তুমি যাও, পান ও মশলা পাঠিয়ে দাও।

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া সরস্বতীর ঠোঁটের কোনে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। সে চলিয়া গেল।

ইন্দ্র বলিল—কয়েক দিন স্কুলে গিয়ে সরস্বতী একটু চটপটে হয়ে উঠেছে।

ব্রজনাথ একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল। বলিল—স্কুলের কথা কি বলছিলেন? ওঁকে কি স্কুলে দিয়েছেন?

ইন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল—বাংলা ও ভালই জানে, অল্প কিছু সংস্কৃতও জানে। ইংরাজি শেখবার ইচ্ছে, তাই স্কুলে যাচ্ছে।

ব্রজনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল—মানদা মারা গেছে? আপনি চিঠিতে খবর পেয়েছেন? কে লিখেছে চিঠি? তার শ্বশুর বা স্বামী কেউ ত আমাকে কিছু জানায়নি।

ইন্দ্র তাহাকে বসাইয়া মানদার আত্মহত্যার কথা, রাজেন বাবুর বাড়ী পুড়িয়া যাইবার কথা, ও তাঁহার গ্রাম ত্যাগ করিবার কথা সংক্ষেপে জানাইল।

ইন্দ্রের মুখে ঘটনা শুনিয়া ব্রজনাথ বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কয়েক ফোঁটা চোখের জল তাহার গাল বাহিয়া পড়িল। ইন্দ্র নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে ব্রজনাথ কিছু শান্ত হইবার পরে স্থির হইল সে তাহার মাতাকে আনিতে তারাপুরে যাইবে।

সে বলিল—আপনারা আছেন, সোমনাথ এখানে থাক। তাকে এখন কোন কথা বলবেন না।

ব্রজনাথ তারাপুরে চলিয়া গেল। ইন্দ্রের বাড়ীতে সোমনাথের আহার ও শয়নের ব্যবস্থা হইল।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল, ব্রজনাথ তখনও তারাপুর হইতে ফিরে নাই। ইন্দ্র তাহার এক চিঠি পাইল।

সে লিখিয়াছে—মানদার খবর মা কিছু জানিতেন না। হঠাৎ আমাকে তারাপুরে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন মানদা বোধ হয় আমাকে লিখিয়াছে, আমি রাজনগর হইতে তাহাকে আনিবার জন্য আসিয়াছি, মৌখিক একটা অনুমতি তাঁহার কাছে আদায় করিবার জন্য তারাপুরে আসিয়াছি। এই সন্দেহ করিয়া প্রথম দিন তিনি আমাকে এড়াইয়া চলিলেন, আমিও কিছু বলিলাম না। দ্বিতীয় দিন তিনি নিজেই মানদার কথা তুলিলেন। সে শ্বশুর বাড়ীতে ভাল আছে, সংসারে তাহার মন বসিতেছে, তাহার শ্বশুর খুব ভাল লোক, এ সময়ে তাহাকে শ্বশুর বাড়ী হইতে আনা সঙ্গত নয় ইত্যাদি নানা কথা বলিলেন।

তিনি থামিলে আমি বলিলাম—মা, মানদার জন্য তোমাকে আর চিন্তা করতে হবে না, সংসার থেকে সে চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে।

তারপর ক্রমে ক্রমে সব কথা জানাইলাম। বলিলাম—জোর ক'রে

বুঝে নাও যে জানো সন্ধান। যাক্‌, একটা মজার কথা বলি শুনুন, কথাটা এখনও গজগজ করছে মাথায়। বিলাতে ষ্ট্রাইক হচ্ছে, ফ্রান্সে হচ্ছে ব্রেড-রায়ট। এ খবরের ওপর মন্তব্য করে আমাদের লার্পেড কাগজের এডিটর কি বলছেন জানেন?

"যে দেশে খাদ্যবস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হইলে স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা করে সে দেশের লোকেরা ভারতবর্ষের সভ্যতার দোষত্রুটি বাহির করিতে আসে ইহা বিস্ময়ের কথা। ভারতবর্ষের লোক খাদ্যাভাবে মরিতে বসিলেও অপরকে আক্রমণ করে না। ইহা দুঃখের বিষয় যে এক শ্রেণীর ইংরাজ এহেন জাতিকে দুরন্ত ও সিডিশাস বলিয়া সমালোচনা করেন।"

—না খেতে পেয়ে মরতে বসলেও কারো গায়ে হাত তোলে না জাতের এই ক্লৈব্য নিয়ে কত গর্ব দেখেছেন?

বীরেন্দ্রের কথা শুনিয়া মিনিট খানেক চুপ করিয়া কি ভাবিল ব্রজনাথ। বলিল—জাতির ক্লীবতাকে উপহাস বা কষাঘাত না করে তা নিয়ে গর্ব করা থেকে বোঝা যায় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে একদল লোক বরাবর রয়েছেন যাঁরা সব রকম প্রোগ্রেসিভ চিন্তার ছোঁয়াচ থেকে দেশের লোককে সরিয়ে রাখতে চান ভারতবর্ষের প্রাচীন কালচার, প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা, প্রাচীন ট্র্যাডিশানের দোহাই দিয়ে। কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন ট্র্যাডিশান, প্রাচীন কালচার যে কি বস্তু তাঁরা কেউ তা জানেন না। প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা যে প্রাচীন সমাজের জন্য রচিত হয়েছিল তা মানতে রাজি নন' তাঁরা। সাতশ বছর পরাধীন থেকে, শুধু আত্মরক্ষামূলক চিন্তাধারার অনুসরণ করবার ফলে স্বাধীন চিন্তার ধারা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। আত্মরক্ষামূলক চিন্তার ধারা যে সব বিধিব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল আজ সেই সকল বকেয়া, বাতিল, পচা জিনিস গুলোকে এঁরা ভারতবর্ষের আদি, অকৃত্রিম, সনাতন জিনিস ব'লে চালাবার চেষ্টা করেন।

ব্রজনাথ থামিলে বীরেন্দ্র হাত তালি দিয়া বলিল—সন্দেহ হচ্ছে, ব্রজবাবু সোশিয়ালিষ্ট ক্লাবের জন্য তৈরী করা বক্তৃতাটা অকালে ছেড়ে দিলেন। ইন্দ্রবাবু, আপনি জমিদার লোক, একটু সমালোচনা করুন ব্রজবাবুর বক্তৃতার।

ইন্দ্র কিছু বলিবার আগে সোমনাথ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিল। ইন্দ্রের কাছে গিয়া তাহার কানে কানে বলিল—বৌদিদির শরীর খারাপ লাগছে। মা আপনাকে ডাকছেন।

ইন্দ্র বলিল—আমার ডাক পড়েছে, উঠলাম।

ইন্দ্র চলিয়া গেলে বীরেন্দ্র বলিল—এত জরুরী তলব কেন?

ব্রজনাথ বলিল—ইন্দ্রবাবুর স্ত্রীর প্রসবের সময় হয়েছে, মা বলছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সোমনাথ আবার ঘরে ঢুকিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া ব্রজনাথ বলিল—কি রে ও বাড়ীর খবর কি?

সোমনাথ একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—আপনি আসুন বড়দা, বৌদিদি কেমন করছেন।

ব্রজনাথ বলিল—ইন্দ্রবাবু কোথায়?

সোমনাথ—তিনি ডাক্তার বাবুর বাঁড়ী গেছেন। মা বললেন, তোর বড়দাকে ডেকে আন।

ব্রজনাথ ও বীরেন্দ্র উঠিল। বীরেন্দ্র বলিল,—আপমি যান। আমি কাল এসে খবর নেবো।

## ১০

দিন তিনেক পরে।

ইন্দ্র নীচের ঘরে পায়চারি করিতেছে, এক একবার উপরে যাইবার সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ উঠিতেছে, আবার নামিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। উপরে লক্ষীর ঘরে ডাক্তার, ধাত্রী, শরৎসুন্দরী ও রাধারাণী রহিয়াছে। ঘরের বাহিরে দরজার কাছে সরস্বতী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। পাশের ঘরে রাধারাণীর মেয়ে নান্টিকে সোমনাথ মহাউৎসাহে গল্প শুনাইতেছিল। গল্প শুনিতে শুনিতে নান্টি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সোমনাথ এক একবার উঠিয়া লক্ষীর ঘরের সম্মুখে ঘুরিয়া আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নান্টির পাশে বসিতেছে।

ভাল ভাল গল্প বলেন। বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা হইবে কেন তাহার? কিন্তু তাহার কয়েক বছরের জীবনের অভিজ্ঞতায় নান্টি বুঝিয়াছে শুধু বড়রা জোর করিতে পারে। নান্টি ছোট্ট, কোন বিষয়েই তাহার জোর করিবার উপায় নাই। কাজেই ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে যাইতে হইল।

রাধারাণী এখানে থাকিবার একটা যুক্তি মনে মনে তৈয়ারী করিয়াছিল। সরস্বতীকে বাদ দিলে এখানে সে লক্ষ্মীর নিকটতম আত্মীয়, শরৎসুন্দরী বাহিরের লোক। আত্মীয় হিসাবে প্রয়োজনের সময়ে তাহার এখানে থাকা কর্তব্য। ইন্দ্রের গৃহে কয়েকটা দিন থাকিবার এই অজুহাত সে ব্যবহার করিল বটে কিন্তু নিজের চোখে সে দেখিতেছিল বাহিরের লোক শরৎসুন্দরী আপন কর্তব্যের, অর্থাৎ প্রসূতির পরিচর্যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ফাঁক রাখেন নাই আর কাহারও জন্য। আর রাধারাণী একাজের জানেই বা কতটুকু?

আসল কথা এই যে পরিচিত সমাজের ও সংসারের গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া রাধারাণীর দেহে যেন মুক্ত প্রান্তরের হাওয়ার স্পর্শ লাগিল। ইন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দেয় রাধারাণী, ঠাকুরপো পূজা করিবার মত দেবতা সে নিজের মনে বলে, এখানকার অন্য প্রত্যেকটি লোকের ব্যবহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সুরে ভরা।

শরৎসুন্দরীকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যায় রাধারাণী। আশ্চর্য হইবার কথা। আগের শরৎসুন্দরী মানদার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া গিয়াছেন। এ শরৎসুন্দরী নূতন মানুষ, যেমন শান্ত তেমনি কোমল। কোন অভিযোগ নাই, বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই, গভীর শোক, মর্মভেদী অনুশোচনা তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নূতন মানুষ তৈয়ারী করিয়াছে। নিজের যে প্রখর স্বাধীন সত্তা ছিল গোবিন্দজীর চরণে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়া শুধু তাঁহার ইচ্ছার যন্ত্ররূপে যেন বাঁচিয়া আছেন।

রাধারাণীর বাল্য জীবন দুঃখের। শৈশবে ও কৈশরে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সে মানুষ হইয়াছে। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সংসারের নগ্ন, কদর্য মূর্তি অহরহ তাহার চোখে পড়িয়াছে। তাহার মাতা অনেকদিন মারা গিয়েছিলেন, এক-মাত্র আশ্রয় ছিল তাহার একান্ত নির্বিরোধী বৃদ্ধ পিতা ও তাঁহার গোপাল। বিদ্যুৎ শিখার মত রূপসী কন্যাকে দুষ্টলোকের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে আড়ালে

একটু পরে সোমনাথের সঙ্গে সরস্বতী আসিল। আসিয়া টেবিলের পাশে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজনাথ বলিল—আজ কি আর পড়বে না?

সরস্বতী মুখ তুলিয়া একবার ব্রজনাথের দিকে চাহিল, তারপর বই লইয়া বসিল।

সেদিনকার মত পড়া শেষ হইল। সরস্বতী চলিয়া গেল। ব্রজনাথ আবার ভাবিতে বসিল।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে নিজের সঙ্কল্প স্থির করিল। সে মনে করিল কিছুদিন বাহিরে ঘুরিয়া আসিলে নিজের মনের অবস্থা সে সঠিক বুঝিতে পারিবে। দিন তিনেক পরে সে ইন্দ্রের কাছে পাঞ্জাব যাইবার কথা বলিল।

সোমনাথ ও সরস্বতীর মধ্যে আবার তর্কযুদ্ধ বাধিয়াছে। এবারকার তর্কের বিষয় অন্য প্রকারের। মিকাডোর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রুশ-জাপানী যুদ্ধের বিখ্যাত সেনাপতি নোগুচি হারিকিরি করিয়াছেন। কাগজে এই সংবাদ পড়িয়া সোমনাথ সরস্বতীর কাছে ছুটিয়া আসিল। বলিল—জানিস সরী দি জেনারেল নোগুচি হারিকিরি করেছেন?

জেনারেল নোগুচি কে, হারিকিরি কি ব্যাপার ও কেন তিনি হারিকিরি করিয়াছেন, সামুরাই মানে কি সরস্বতীকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিতে হইল। সব শুনিয়া সরস্বতী বলিল—রাজা মরলেন তাই মনের দুঃখের নিজের পেট কেটে মরলেন! কি বুদ্ধি দেখ।

সোমনাথ উগ্র প্রো-জাপানীজ। সরস্বতীর তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক মন্তব্যে ক্রোধে ও বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাহার বাকরোধ হইল। তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিল—তোমাকে কোন কথা বলাই ভুল। মেয়েছেলের বুদ্ধি আর কত হবে?

এই শ্লেষাত্মক মন্তব্য কানে না তুলিয়া সরস্বতী বলিল,—তোমার ঐ নোগুচি মনে মেয়েছেলে ছিল। পুরুষ মানুষ কখনও আত্মহত্যা করে?

ইহার পর ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল।

ব্রজনাথ পাঞ্জাব রওনা হইবার দিন তিনেক আগে বীরেন্দ্রের সোশিয়ালিষ্ট ক্লাবের বাৎসরিক অধিবেশন ছিল। সেক্রেটারী বীরেন্দ্র ইন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ব্রজনাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়া ক্লাবে লইয়া গেল।

বাৎসরিক বিবরণী পাঠ ও সভাপতির বক্তৃতার পরে মিটিঙের কাজ শেষ হইল। সভ্যরা এক একখানি টেবিল ঘিরিয়া চার পাঁচজন করিয়া বসিলেন। প্রত্যেকটি দলের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হইল।

ব্রজনাথ, ইন্দ্র এবং আরও দুইজন ভদ্রলোক এক টেবিলে বসিলেন। কেক, বিস্কুট ও কফি আসিল। খাওয়া ও আলোচনা চলিতে লাগিল।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রুধোন, লাসাল, মার্কস ও এঞ্জেলস, সিডনে ওয়েব, বিয়াট্রিস পটার, বার্ণাড শ প্রভৃতি বহু অপরিচিত নাম ইন্দ্র শুনিতে পাইল। পরিচিত নামের মধ্যে কেয়ার হার্ডি, হিণ্ডম্যান ও শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার নাম শুনিল। সায়ান্টিফিক সোসিয়ালিজম ও রিফর্মিষ্ট দলের মধ্যে বিবাদের কথাও সে শুনিল। সোশিয়ালিজম সম্বন্ধে কিছু জানা না থাকায় আলোচনার তাৎপর্য সে কিছু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বুঝিল যে নিজের দেশের কথা লইয়া এই ক্লাবের সদস্যরা বিশেষ মাথা ঘামান না, কারণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণীর কথা অনেকবার উঠিল কিন্তু ভারতবর্ষের কথা একবারও কেহ বলিলেন না। ব্রজনাথ ও বীরেন্দ্রের যতটুকু পরিচয় সে জানিত তাহা বিবেচনা করিয়া সে বুঝিতে পারিল না তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে এই ক্লাবের সভ্য হইয়াছেন। এই ক্লাব কয়েকজন ইংরেজি পোষাক পরা ইংরাজি ভাষায় আলাপকারী, সমাজের উচ্চতর স্তরের ভদ্রলোকের পরস্পরের সঙ্গে মিলিবার মিশিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে, না ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

নীরবে বসিয়া সে সভ্যদের মধ্যে আলোচনা শুনিল, সভা শেষ হইলে ব্রজনাথের সঙ্গে বাড়ী ফিরিল। সে ভাবিল অবসর মত ব্রজনাথের বা বীরেন্দ্রের কাছে ক্লাবের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিবে।

ব্রজনাথ পাঞ্জাব রওনা হইয়া গেল।

ব্রজনাথের লাহোরে পৌঁছিবার খবর যে দিন আসিল সে দিন সন্ধ্যার

ইচ্ছা জানাইল। তারপর সুস্থ অবস্থায় যেমন গোবিন্দজীর নাম জপ করিত তাহাই করিতে লাগিল।

রঘুনাথের অবস্থা সম্বন্ধে হাসপাতালের রিপোর্ট ও তাহার ইচ্ছার কথা জানিতে পারিয়া জেল কর্তৃপক্ষ কয়েকটা দিন চিন্তায় কাটাইয়া যে দিন শরৎ-সুন্দরীকে সংবাদ পাঠাইলেন সেইদিন শেষরাত্রে রঘুনাথ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইল।

দেশের স্বাধীনতা আনিবার সাধনায় উৎসর্গীকৃত একটি জীবন কীটদষ্ট পুষ্প কোরকের মত অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

শরৎসুন্দরী সোমনাথকে সঙ্গে লইয়া যথা সময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। জেলকর্তৃপক্ষের তখনও রঘুনাথের মৃত্যু সংবাদ তাহার আত্মীয় স্বজনকে পাঠাই-বার সময় হইয়া উঠে নাই। তাঁহাদের মুখে সংবাদ শুনিয়া শরৎসুন্দরী পাষাণের মত নিস্পন্দ হইয়া গেলেন।

তারাপুরে ফিরিয়া গোবিন্দজীর মন্দিরে ঢুকিলেন শরৎসুন্দরী। নিঃশব্দে হাহাকার করিয়া গোবিন্দজীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

সোমনাথ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইন্দ্রকে সকল সংবাদ জানাইয়া পত্র দিল ও তাহার বড় দাদাকে খবর দিবার অনুরোধ করিল। তারপর প্রতিবেশীদের সাহায্য লইয়া কাকার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

প্রতিবেশীরা বলাবলি করিতে লাগিল সোমনাথের বয়স যেন হঠাৎ পাঁচ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে, সেই হাসিখুশী, সদা আনন্দময় ছেলেমানুষ সোমনাথ আর নাই। তাহারা বলিল শোকে মানুষের এই রকম পরিবর্তন হয়, সোমনাথ ছেলে মানুষ হইলেও কাকার মৃত্যুশোক তাহার প্রাণে বড় লাগিয়াছে। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল কি চূড়ান্ত কষ্ট পাইয়া রঘুনাথ মরিয়াছে।

ইন্দ্র ব্রজনাথকে রঘুনাথের মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া যে তার করিয়াছিল তাহার কোন উত্তর আসিল না।

রঘুনাথের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কয়েকদিন ইন্দ্রের মনের বিষন্নতা আর ঘুচিতে চাহে না। রঘুনাথকে সে কখনও দেখে নাই কিন্তু তাহার পরিবারের আর সকলেই তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত হইয়া গিয়াছিল। রঘুনাথের মৃত্যুতে সে আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করিল।

সে ভাবিল আজ কি হাওয়া বহিতেছে এই সুবিস্তীর্ণ দেশে, এই আম জাম, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল গাছের ছায়ায় ঘেরা বাংলার আকাশে বাতাসে যে চিরকালের উদাসীন স্বভাব এই জাতির মধ্যে কত গ্রামে কত ঘরে আগুনের ফুল্‌কির মত নূতন নূতন মানুষ জন্মিতেছে? সে জানিত শুধু রাজনগরকে। রাজনগরের পরে আসিল তারাপুর। তারাপুরের একটি পরিবারের বিষাদময় ইতিহাসের মধে সে কি দেশের অগণিত পরিবারের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখিতেছে না?

মনে এই চিন্তা লইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে ইন্দ্র খোলা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঘমুক্ত আকাশ তারায় উজ্জ্বল, শীতের হাওয়া গায়ে লাগিল।

উজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ ইন্দ্রের মনে হইল পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলর জেলের দৃঢ় লোহার জালে ঢাকা কক্ষ হইতেও কি এই উজ্জ্বল আকাশ দেখা যায়? আন্দামানের নারিকেল গাছের নিবিড় অরণ্যের ফাঁক দিয়াও কি এই উজ্জল অকোশ দেখা যায়? নারিকেল ছিবড়ার দড়ি পাকাইতে পাকাইতে রক্তাক্ত হাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া কি—

সরস্বতী ঘরে ঢুকিয়া ইন্দ্রকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া সন্তর্পণে ডাকিল—দাদা!

ইন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইতে সে মৃদু কণ্ঠে বলিল—আজ এই চিঠিখানা এসেছে, দিদি দিলেন।

হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি ইন্দ্রের হাতে দিয়া সে চলিয়া গেল। ইন্দ্রের চিঠির উত্তরে ত্রিনয়নী লিখিয়াছেন।

লিখিয়াছেন—কর্তা ক'দিন হল আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তিনি উত্তর দেবেন বলেছিলেন কিন্তু অসুখের জন্য দেরি হচ্ছে বলে আমাকে উত্তর দিতে বললেন।

নাতনী দেখতে কেমন হয়েছে তার দাদু জানতে চেয়েছেন। গায়ের রং কেমন হয়েছে? মুখ চোখ কার মত হয়েছে? দাদুর ইচ্ছে নাতনীর নাম হোক মিনু, ভাল নাম মৃণালিনী, তোদের কি এ নাম পছন্দ হবে? আমি বলেছিলাম যাদের মেয়ে তারাই নাম রাখুক। তিনি শুনলেন না, আমাকে বললেন লিখে দাও। ওদের ইচ্ছে হয় অন্য নাম রাখবে, আমি এই নামেই নাতনীকে ডাকব।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় পুলিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য রাজেন বাবুর জনপ্রিয়তার কথা। আরও মনে পড়িল কিশোর রাঘব তাহাদের বালক সমিতির একজন উৎসাহী পাণ্ডা ছিল। বৃদ্ধ, সর্বস্বান্ত রাজেন বাবু এখন কোথায় কে জানে?

সেদিন দুপুর বেলা মেয়েকে লইয়া রাধারাণী আসিল। নান্টির হাতে একটা ডল, রাধারাণীর হাতে কতকগুলো ফ্রক, লক্ষ্মীর মেয়ের জন্য।

নান্টি সোজা লক্ষ্মীর ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ত্যাখো, বেবীর জন্য ডল এনেছি। বেবী কোথা?

লক্ষ্মী রাধারাণীকে বসাইল। বলিল—আপনি এসেছেন দিদি বড় ভাল হল। বাড়ীতে লোকজন কম, ভাল লাগছিল না।

নান্টি ততক্ষণ ঘুমন্ত বেবীকে আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা বেবী উঠিয়া ডল লইয়া তাহার সঙ্গে খেলা করুক।

রাধারাণী বলিল—নান্টি, ওর কাঁচা ঘুম ভেঙ্গো না, শরীর খারাপ করবে।

নান্টির আদরে তখন বেবীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, সে চোখ মেলিয়া চাহিল।

নান্টি সোল্লাসে হাততালি দিয়া বলিল—বেবী জেগেছে, জেগেছে! বেবী ডার্লিং, এই ত্যাখো তোমার জন্য কেমন ডল এনেছি।

সরস্বতী ঘরে ঢুকিল। নান্টির কাণ্ড দেখিয়া সে হাসিতে লাগিল। লক্ষ্মী এবং রাধারাণীও নান্টি ও বেবীর দিকে চাহিয়া হাসিল।

সোমনাথকে লইয়া শরৎসুন্দরী তারাপুর হইতে ফিরিলেন।

শরৎসুন্দরী ব্রজনাথের কথা জানিতে চাহিলেন। ইন্দ্র—জানাইল সে দিল্লী হইতে রাজপুতানায় গিয়াছে। তাহার কাকার মৃত্যু সংবাদ যে তারে পাঠান হইয়াছিল বোধ হয় তাহা সে পায় নাই। ইন্দ্র নূতন ঠিকানায় আর সে সংবাদ দেয় নাই।

শুনিয়া শরৎসুন্দীর বলিলেন—না দিয়ে ভালই করেছ বাবা। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেড়াক। একদিন খবর ত শুনবেই।

ইন্দ্র দেখিল শরৎসুন্দরী আরও কৃশ ও বার্দ্ধক্যগ্রস্থ হইয়াছেন এই কয়েক

দিনের মধ্যে। কথাবার্তায়, ব্যবহারে কেমন একটা নির্লিপ্তভাব আসিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল তিনি নিজেই ব্রজনাথের বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিবেন। কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া দেখিল তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না।

লক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার কথা হইল। লক্ষ্মী বলিল—ওঁকে এখন কিছু বলবার দরকার কি? কথা ঠিক হয়ে আছে। ব্রজবাবু ফিরলে তাঁকে জিজ্ঞেস করে দিন স্থির করতে হবে।

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শোকে দুঃখে ওঁর মন সংসার থেকে চলে গেছে। উনি চান তারাপুরে গোবিন্দজীর কাছে ফিরে যেতে। সেদিন আমার কাছে যা বললেন তা থেকে আমার ঐ কথা মনে হল। এক দেখি খুকুকে কোলে বসিয়ে দিলে ওঁর ভাবের পরিবর্তন হয়।

সোমনাথের বিমর্ষভাব দুই চারিদিনের মধ্যে অনেকটা কাটিয়া গেল। ইংরাজি কথার উচ্চারণ বা ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ লইয়া সরস্বতীর সঙ্গে সে আর ঝগড়া বাধায় না, কিন্তু খুকুকে কোলে করিবার দাবি লইয়া প্রায়ই দুইজনে কলহ বাধে। লক্ষ্মীর কাছে আপিলে সোমনাথের জয় অবধারিত জানিয়া সরস্বতী কলহে তেমন জোর দেয় না। কিন্তু তাহাতে সোমনাথের কলহ প্রবৃত্তির উপশম হয় না।

আজ সকালে ঐ দাবি লইয়া কলহের সূত্রপাত হইল। সূত্রপাতে সে লক্ষ্মীর সম্মুখেই সরস্বতীকে বলিল—তোমার ত শিগগির বিয়ে হবে, মেয়েও হবে, তুমি তাকেই কোলে নিয়ে থেকো, মিনুকে আর কোলে নিতে হবে না!

হাত বাড়াইয়া ছুঁইবার ভঙ্গী করিয়া আবার বলিল—তোমার মেয়ে হলে তাকে আমি ছোঁবও না।

সরস্বতী ঝগড়া করিবে কি, উঠিয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

জলযোগ করিয়া বীরেন্দ্র বিদায় লইল। সে যাইবার সময়ে ব্রজনাথ বলিল—কাসাই নদীতে খুব বন্যা হয়েছে খবর বেরিয়েছে, শুনেছেন বীরেন্দ্র বাবু?

বীরেন্দ্র বলিল—শুনেছি। ছেলেরা একটা রিলিফ পার্টি গড়বার জন্য পেড়াপীড়ি করছে।

কয়েক দিন পরে ব্রজনাথ তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া কি কাজ করিতেছে ইন্দ্র ঘরে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া ব্রজনাথ এমন চমকিয়া উঠিল যে ইন্দ্র একটু বিস্মিত হইল, অপ্রস্তুত বোধ করিল।

বলিল—আপনি কি বিশেষ ব্যস্ত আছেন?

ব্রজনাথ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল বলিল,—বসুন, বসুন। আমি বিশেষ কেন, কিছুমাত্র ব্যস্ত নই, আপনি বসুন।

ইন্দ্র বসিল। ব্রজনাথও বসিল। কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল না। ইন্দ্র লক্ষ্য করিল ব্রজনাথ ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, কিছু অস্বস্তি বোধ করিতেছে। অন্যমনস্ক ভাবে সে টেবিলের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলেও সে আর কোন কথা মা বলায় ইন্দ্র বলিল—আপনার মা তারাপুরে ফেরবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। এদিকে আমার শ্বশুর মশায়ের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না, তিনি তাগাদা দিয়েছেন। তাই আর একটু দেরি করবার ইচ্ছে থাকলেও কথাটা এখনই পাড়তে হচ্ছে। আপনার মা এ বিষয়ে কিছু বলেছেন?

ব্রজনাথ মুখ না তুলিয়া একটু ক্ষীণ হাসিয়া বলিল—কি বিষয়ে?

ইন্দ্র—আপনার বিবাহের সম্বন্ধে! আমার শ্যালিকার সঙ্গে আপনার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম আমরা। তিনি—

বাধা দিয়া ব্রজনাথ খুব তাড়াতাড়ি বলিল—তিনি বলেছেন আমাকে। তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে বলেছেন। সংসার দেখতে অসমর্থ হয়েছেন, বলছেন, তারাপুর যেতে চান বলেছেন। রূপে, গুণে—মানে তাঁর পছন্দের কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের পরিবারের ভগ্নদশা—

সে মিনুকে কোলে লইবার জন্য অগ্রসর হইল।

লক্ষ্মীও ইন্দ্রের মধ্যে কথা হইল। এইবার রাজনগরে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

লক্ষ্মী বলিল—আগে বাবাকে খবর জানিয়ে দিন স্থির করবার জন্য লেখো।

ইন্দ্র ছোটখাট একটা ভোজের ব্যবস্থা করিতে চাহিল। বীরেন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ব্রজনাথকে সঙ্গে লইয়া সে তাহার গৃহে গেল। বীরেন্দ্রকে পাওয়া গেল না। শুনিল আর্ত্তত্রাণ কাজের জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক লইয়া আগের দিন বীরেন্দ্র ঘাটালে চলিয়া গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন বাড়ীর কেহ বলিতে পারিল না।

ব্রজনাথের মনের অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়া গিয়াছে। দিদির আদেশে সরস্বতী আবার তাহার কাছে পড়িতে আসিয়াছিল কাল।

ব্রজনাথের কাছে আবার পড়িবার প্রস্তাবে সরস্বতী লজ্জিতভাবে আপত্তি জানাইতে লক্ষ্মী বলিল—আমার কথা মেনে চল সরী। ব্রজবাবু পণ্ডিত লোক, শহরে থাকেন। তাঁর স্ত্রীর কিছু শিক্ষিত হওয়া দরকার একথা তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে কেন ভাই? তিনি নিজে যখন তোর শিক্ষার ভার নিয়েছেন তাঁর ইচ্ছামত চল। এতে দোষের কিছু নেই, লজ্জা করবার কিছু নেই।

বই খাতা লইয়া সোমনাথকে সঙ্গে লইয়া সরস্বতী তাহার কাছে পড়িতে আসিলে প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেও ব্রজনাথ মনে মনে আহ্লাদিত হইল। সত্য বলিতে কি এতটা সে প্রত্যাশা করে নাই বা করিতে সাহস পায় নাই।

পড়া শেষ হইলে সরস্বতী যাইবার সময়ে ব্রজনাথ বলিল—তুমি কি রোজ পড়তে আসবে?

সরস্বতী লজ্জিতভাবে মুখ নীচু করিল, মৃদুস্বরে বলিল—আসবো।

ব্রজনাথ বলিল—আচ্ছা।

কিন্তু কাজ বন্ধ হয় নি। রাজপুতানার খবর আমরা খুব কম পাই। উত্তর ভারতের যে দলের কথা বলছি তার মধ্যে রাজপুতানার লোক আছে।

—দ্বিতীয় দল হচ্ছে দিল্লীর নিষ্কলঙ্কী দল। এরা প্রকৃত বিপ্লবী দল নয়। এদের মত ও পথ একটু অদ্ভুত রকমের। শুনলাম ২৫।৩০ বছর ধরে এই ক্ষুদ্র দলটি পৃথিবীতে সত্যযুগ অবতীর্ণ হবার জন্য ও ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা করছেন। এঁরা মনে করেন কল্কি অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন, শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবেন ও পৃথিবীতে সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা করবেন। এঁদের ধারণা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবার আর অস্ত্রধারণ করা আবশ্যক হবে না। ভারতবর্ষের শত্রুপক্ষ নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংস হবে। এই দলের লোকেরা মনে করেন কল্কি অবতারের কাছে ভারতবর্ষের মঙ্গলের ও স্বাধীনতার প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তাঁদের বিশ্বাস শুধু ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রার্থনার দ্বারা ঈপ্সিত ফললাভ হবে। শুধু প্রার্থনার শক্তিতে বিশ্বাসী হলেও প্রকৃত বিপ্লবীদের সঙ্গে এঁরা গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। দলের অধিকাংশ লোক ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। খাঁটি সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গেও এঁদের সংযোগ আছে। উচ্চতর ধর্মজীবনের সাধনার সঙ্গে অহিংস বা বৈষ্ণবীয় মনোভাবের চর্চা এই নিষ্কলঙ্কী দলের বৈশিষ্ট্য বলে মনে হল। এই দলের বালমুকুন্দের দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলায় ফাঁসী হয়েছে।

—তৃতীয় দলটি গড়ে উঠেছে বেনারসে বাঙালী ছেলেদের মধ্যে। এই দলের ছেলেরা একদিকে বাংলার দলগুলি ও অন্যদিকে উত্তর ভারতের রাসবিহারী বাবুর দলের সঙ্গে সংযোগ রাখতে চেষ্টা করছেন। এই হিন্দু দলগুলি ছাড়া মুসলমান বিপ্লবী দলের কথাও শুনলাম।

ইন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—মুসলমানদের মধ্যে গুপ্ত বিপ্লবীদল আছে না কি ?

ব্রজনাথ—তাই ত শুনলাম। এই দলের সূচনা হয় ১৯১১ থেকে যখন রেডক্রেসেণ্ট সমিতির সভ্য হয়ে একদল ভারতীয় মুসলমান তুর্কীতে গিয়েছিলেন। তুর্কী থেকে প্রচুর ইংরেজ বিদ্বেষ নিয়ে এঁরা দেশে ফিরলেন। গোপনে ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করা আরম্ভ হল। ধীরে ধীরে পঞ্জাব থেকে বর্মা পর্যন্ত এই

## ১৪

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস।

ইন্দ্রের রাজনগরের ফিরিবার আয়োজন আরম্ভ হইল। এই আয়োজনের প্রথম পর্ব বিবাহের বাজার করা। ত্রিনয়নী তালিকা ও টাকা পাঠাইয়াছিলেন ইন্দ্রের নায়েবের হাতে। নায়েব বাজার ঘুরিয়া জিনিষপত্র কিনিতে লাগিল। স্থির হইল ইন্দ্র চলিয়া গেলে কয়েকদিন পরে ব্রজনাথ শরৎসুন্দরী ও সোমনাথকে লইয়া তারপুরে যাইবে ও সেখান হইতে বিয়ের দুইদিন আগে রাজনগরে পৌঁছিবে।

সোমনাথের এই ব্যবস্থা মনঃপুত হইল না। সে লক্ষ্মীর কাছে দরবার আরম্ভ করিল সরীদি ও মিনুর সঙ্গে সে রাজনগরে যাইবে।

লক্ষ্মী বলিল—তুমি ত বরকর্তা, কনে যাত্রী হতে যাবে কেন ভাই?

সোমনাথ সে কথায় কান দিল না। লক্ষ্মীকে বলিতে হইল—মাসীমাকে বলি, তিনি মত দিলে আমাদের সঙ্গে যেও। তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

সোমনাথ তখন মাকে ধরিল।

শরৎসুন্দরী বলিলেন—ব্রজকে বল। সে রাজি হলে আমার অমত নেই।

সোমনাথ দাদাকে চট করিয়া তাহার প্রস্তাব জানাইতে সাহস করিল না, সুযোগের অপেক্ষায় রহিল।

কয়েকদিন আগে রাধারাণী আসিয়াছিল লক্ষ্মীকে দেখিতে। সেই কথা তুলিয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে বলিল—একটা কথা তোমাকে জানানো হয়নি। দিদির কথার ভাবে বুঝলাম তাঁর রাজনগরে যাবার ইচ্ছে আছে। বিয়ে উপলক্ষ্যে তাঁকে যাবার নিমন্ত্রণ করলে কেমন হয়?

ইন্দ্র বলিল—দেবনাথ দা কি মত দেবেন? কাল কি পরশু আমি নিজে

ব্রজনাথের গৃহে ইন্দ্র, ব্রজনাথ ও বীরেন্দ্রের মধ্যে আলাপ হইতেছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপের ফলে মুক্তি পাইয়া বীরেন্দ্র ঘাটাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বীরেন্দ্রের গ্রেপ্তারে স্বেচ্ছাসেবক দলের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়, কাজকর্ম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। অবস্থা দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন।

বীরেন্দ্র নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছিল। সে বলিল—আমাদের দেশের লোকের চরিত্রের এত অধোগতি হয়েছে ব'লে ইংরাজ কর্মচারীরা যা ইচ্ছে করতে সাহস পায়। কে খয়রাতি সাহায্য একটু কম পেল, কে একটু বেশী পেল এই নিয়ে খেয়োখেয়ি লেগেই রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকেরা নাকি যে বাড়িতে অল্পবয়সের মেয়ে আছে সে বাড়িতে বেশী সাহায্য দেয়, ঔষধ দেবার অজুহাতে যুবতী মেয়েদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে—এই সব অভিযোগ গভর্ণমেণ্টের লোকের কাছে করা হয়। রিলিফের চাল, ডাল, কাপড় ইত্যাদি বেশী দামে বেচে দেবার ব্যবসায়ও চলে গোপনে। কয়েকটা ব্যাপার ধরা পড়াতে বদমায়েসগুলো চটে গিয়ে সাব-ডিভিশানাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বেনামী দরখাস্ত পাঠায়। অথচ কত লোক যে সর্বস্বান্ত হয়েছে, কতলোক আমাশয়ে, জ্বরে ভুগছে তার ইয়ত্তা নেই। এক কলেরাতেই কত লোক মরেছে। রিলিফ না দিলে গ্রামকে গ্রাম সাফ হয়ে যেত।

ইন্দ্র বলিল—আপনার দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা ফিরে আসতে চাইল না আপনার সঙ্গে?

বীরেন্দ্র—তারা ফিরে আসবার জন্য তৈরী হয়েছিল, অনেক কষ্টে থামিয়েছি। যাদের শরীর খুব খারাপ হয়েছিল এমন কয়েকজন চলে এসেছে।

একটু থামিয়া বীরেন্দ্র আবার বলিল—ক্ষুদে সরকারী কর্মচারীদের মোড়লীতে কাজ করা আরও বিরক্তিজনক মনে হয়। আমার কাছে ধমক খেয়ে কয়েকজন ত রীতিমত শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ব্রজনাথ—এখন কি করবেন? ঘাটালে ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে?

বীরেন্দ্র—ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে, তবে গেলে অন্য কোন কেন্দ্রে যাব, ঘাটালে আর যাব না। তার আগে শরীরটা ঠিক করে নিতে হবে। দিনরাত জল কাদার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে শরীরটা বে-জুত হয়েছে, খাটুনিও গিয়েছে খুব।

ষড়যন্ত্রের মামলার পলাতক আসামী রাসবিহারী বসুর নাম পাইয়াছে। বীরেন্দ্র এপর্যন্ত ফিরে নাই, ফিরিলে পুলিশ তখনই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে সন্দেহ নাই। রাস্তার ওপারে পানের দোকানের সম্মুখে শাদা কাপড়ে দুইজন পুলিশ সব সময়ে বসিয়া থাকে।

বীরেন্দ্রের ছোট ভাই বলিল—আমারাও হাবড়া ও শেয়ালদা ষ্টেশনে চব্বিশ ঘণ্টা লোক বসিয়ে রেখেছি দাদাকে দেখতে পেলে সাবধান করে দেবে।

ফিরিবার পথে ইন্দ্র বলিল—বীরেন্দ্রবাবু সোশিয়ালিষ্ট মতে বিশ্বাসী বলে জানতেম।

ব্রজনাথ বলিল—তিনি সোশিয়ালিষ্ট মতে বিশ্বাসী, তবে ফেবিয়ান মতের সোশিয়ালিষ্ট নয়। তিনি আপনাকে বলতেন রেভোল্যুশনারী সোশিয়ালিষ্ট। অর্থাৎ, তাঁর মতে সোশিয়ালিজম আনতে হবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা, সংস্কারের দ্বারা নয়। বাইরের লোককে একথা তিনি জানাতেন না।

ইন্দ্র বলিল—এদিকে অনুশীলন সমিতি ও রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল জানা যাচ্ছে।

ব্রজনাথ—সেটা কতটা সত্যি বলা যায় না। তবে অনুমান হয় সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবার জন্য দেশে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা দরকার মনে করতেন।

ইন্দ্র—একটা কথা আমার মনে এল, আপনাকে বলছি। আদিনাথের কাহিনী ও বীরেন্দ্রবাবুর এই ব্যাপার থেকে মনে হয় বড় একটা তোড়জোড় চলছে দেশে যার খবর আমরা রাখিনে।

ব্রজনাথ—কথাটা আমার মনেও উকি দিয়েছে। কে জানে য়ুরোপের আকাশে যে কালো মেঘ জমেছে তার দিকে লক্ষ্য রেখে দেশে নূতন কোন উদ্যম আরম্ভ হয়েছে কি না?

ইন্দ্রও সেই কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল বাংলায়, মহারাষ্ট্রে, পঞ্জাবে, মাদ্রাজে, দিল্লীতে যে উদ্যম বিচ্ছিন্নভাবে দেখা গিয়াছে এবার তাহাকে সংহত করিয়া প্রচণ্ড আঘাত জানিবার দুঃসাহসিক অভিযান আরম্ভ হইবে কি?

বীরেন্দ্রের আকস্মিক অন্তর্ধানে তাহারা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছিল। ফিরিবার সময় উভয়ে নিজের মনে চিন্তায় মগ্ন রহিল।

## ১৫

কলিকাতার বাস উঠাইয়া ইন্দ্র সপরিবারে রাজনগরে রওনা হইল।

সকাল ৭ টায় গাড়ী অতি পরিচিত, অতি প্রিয় রাজনগর রোড ষ্টেশনে থামিল।

ইন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া একবার চারিদিকে চাহিল। প্রভাব সূর্যের আলোকে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া মনে মনে বলিল—আঃ! এতদিন পরে!

নায়েব আনিয়া প্রণাম করিল, আজাহার সর্দারের পুত্র দেরাজ মাটিতে লাঠি রাখিয়া আভূমি নত হইয়া সেলাম করিল।

একমুখ হাসিয়া দেরাজ বলিল—হুজুর আইল্যান! বাপজান আসতি মন করছিল, বাতের ব্যামো বাড়িছে, হাঁটতি পারে না, তাই মানা করলাম।

ষ্টেশন মাষ্টার মল্লিক মশাই ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন।

সোমনাথ গাড়ী হইতে নামিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে তাহার জিদ বজায় রাখিয়াছে। দাদার কাছে অনুমতি আদায় করিতে তাহাকে বিশেষ কষ্ট করিতে হয় নাই।

লক্ষ্মীর কাছে গিয়া সে বলিল,—বৌদিদি, আপনাদের রাজনগর কোনদিকে?

লক্ষ্মী দিক নির্দেশ করিয়া দেখাইল, তারপর কি ভাবিয়া যুক্তকর কপালে ঠেকাইল বহু মাঠ, শস্যক্ষেত্র, বাগান, বসতির ওপারে তিন মাইল দূরে অবস্থিত রাজনগরের উদ্দেশ্যে।

সকন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুইখানা পাল্কীতে রওনা হইল, দেরাজ পাল্কীর সঙ্গে চলিল। সোমনাথকে সঙ্গে লইয়া সজ্জিত মহিষের গাড়ীতে উঠিল ইন্দ্র।

মহিষের চেহারা দেখিয়া সোমনাথ অবাক। বলিল—এযে হাতীর মত মোষ। তারাপুরের মোষ এর অর্দ্ধেকও নয়। লোকে বলে খিয়েরের গরু মোষ সব ছোট হয় আর মানুষ হয় শুকনো।

বারোয়ারী কালীবাড়ীর নাটমন্দির ডাহিনে রাখিয়া ইন্দ্রের গাড়ী যখন বাঁদিকে ঘুরিয়া গ্রামের পথ ধরিল পোষ্টাফিসের বারান্দা হইতে উমানন্দ

সোমনাথের কাছে এই তথ্য জানিতে পারিয়া কলিকাতা হইতে কয়েকটি পিস্তল ও বোমা তাহাকে পাঠাইবার জন্য সে সাগ্রহ আবেদন জানাইল সোমনাথের কাছে। কিন্তু দলের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের উপর সোমনাথের নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া এক দুর্বোধ্য রহস্য বলিয়া মনে হইল। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ একক পুষ্পকে লইয়া গঠিত।

পুষ্প বাক্যে দলের নেতার প্রতি প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। আর আচরণে, হাঁ তাহার আচরণ ছিল বেশ একটু হেঁয়ালিভরা। ছোট দলটির মধ্যে মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করিবার মত বয়স কাহারও হয় নাই। তাই তাহার আচরণের ফলে পুষ্পের ঝগড়াটে বলিয়া অখ্যাতি আরও একটু বাড়িল।

পুষ্প দল ছাড়িত না আবার দলের সকলের সঙ্গে যখন ঝগড়া করিতেও ছাড়িত না। একদিন তাহার অকারণ কলহ প্রিয়তায় বিরক্ত হইয়া উমানন্দ বলিল—তুমি আর আমাদের সঙ্গে এসো না। মা বলেছেন তুমি বড় হয়েছ, বেশী পাড়ায় বেড়ানো ভাল না।

রুষ্টস্বরে পুষ্প বলিল—বেশ করব বেড়াব। যাও, তোমরা চলে যাও। আমি একা একা বেড়াব।

একা বেড়াইবার সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়া সে হন হন করিয়া একদিকে চলিতে থাকে। সোমনাথ তাহাকে শান্ত করিবার জন্য অগ্রসর হয়। বলে—পুষ্প রাগ করো না। আমাদের সঙ্গে এসো।

পুষ্প তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিতে থাকে। সোমনাথ পিছন হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলে, বলে—এসো লক্ষ্মীটি।

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া পুষ্প তীব্রস্বরে বলে—আমার হাত ছেড়ে দাও, নইলে আঁচড়ে দেব এখুনি।

হিমাংশু ডাকিয়া বলে—দিদিটা সত্যি বেড়ালের মত আঁচড়ে দেয় সোমনাথ দা, ওকে ধরবেন না। সে দিন আমার এইখানে আঁচড়ে দিয়েছিল।

সে হাত দিয়া নিজের বাম স্কন্ধ দেখাইল।

সোমনাথ তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। তাহার ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিয়া বলিল—সত্যি এখনও তোমার আঁচড়াবার কামড়াবার অভ্যাস আছে? পালাই তা'হলে।

উমানন্দ ও হিমাংশুকে লইয়া সোমনাথ চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল মাথা নীচু করিয়া ধীর পদক্ষেপে পুষ্প আসিতেছে। কি ভাবিয়া সোমনাথ সেখানে দাঁড়াইল। উমানন্দকে বলিল—আনন্দ, তুমি আর হিমাংশু এগিয়ে যাও, আমি ওকে নিয়ে আসছি। বাড়ী গিয়ে তোমার নামে নালিশ না করে আবার, ও যা মেয়ে।

সোমনাথকে দাঁড়াইতে দেখিয়া পুষ্প দাঁড়াইল। সোমনাথ ডাকিয়া বলিল —পুষ্প এসো।

পুষ্প আসিল না। সোমনাথ তাহার কাছে গিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল পুষ্পের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

ব্যস্ত হইয়া সোমনাথ বলিল—কি হয়েছে পুষ্প, কাঁদছ কেন ?

পুষ্প আঁচল তুলিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। বলিল—আমি কি সত্যি তোমাকে আঁচড়াতাম ? কেন আমাকে ও কথা বললে ?

সোমনাথ হাসিল। বলিল—তুমি এত শক্ত শক্ত কথা বলতে পারো আর আমার এই হাসির কথায় কান্না পেল ? কি ছেলে মানুষ তুমি ! এসো, এসো, ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

পুষ্প সোমনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—যাক্। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

সোমনাথ হাসিয়া বলিল—বেশ, চলো।

কলহ ও সন্ধি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

ত্রিনয়নীর মুখে সোমনাথ পুষ্প ও হিমাংশুর কাহিনী শুনিয়াছিল। শুনিয়া তাহার মন ভাই বোন দুইটির প্রতি গভীর সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়াছিল।

হিমাংশুকে তাহার বড় ভাল লাগিত। ঐটুকু ছেলের মনে কি প্রবল ইংরাজ বিদ্বেষ। যে ভাষায় ও ভঙ্গীতে সে এই বিদ্বেষ প্রকাশ করিত অন্যের কাছে তাহা কৌতুকের বিষয় ছিল। সোমনাথ ভাবিত ইহা ত স্বাভাবিক। বড় হইয়া বাঁশের কঞ্চির অস্ত্র ছাড়িয়া সে যখন রিভলবার তাক করিবে তখন কেহ আর কৌতুক বোধ করিবে না। কলিকাতা হইতে কয়েকটা পিস্তল ও বোমা পাঠাইবার জন্য প্রায় প্রতিদিনই সে সোমনাথে কাছে আবেদন

লক্ষ্মী ছাড়া আরেকজন সোমনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদের চিন্তায় আকুল হইল। সে পুষ্প।

পুষ্প অল্প কয়েকটি দিন সোমনাথের সঙ্গে মিশিয়াছে। দুই ছেলে মানুষ ঝগড়া ও ভাব করিতে করিতে কয়েকটা দিন কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, বিচ্ছেদের মুহূর্ত যেন হঠাৎ আসিয়া পড়িল। পুষ্প ছেলে মানুষ, জানে না কিসে কি হইল ; মাত্র কয়েকটি দিনের পরিচিত এই প্রিয়দর্শন খেলার সাথীটি আজ চলিয়া যাইবে ভাবিয়া এক অস্পষ্ট, অবোধ্য বেদনায় তাহার ক্ষুদ্র চিত্ত ভার হইয়া উঠিল।

সোমনাথের যাওয়া বন্ধ করিবার সম্ভাবিত উপায় সম্বন্ধে কত কল্পনা তাহার মনে উদয় হইল। শেষ পর্যন্ত এই সব কল্পনা বাতিল করিয়া অঞ্চলের নীচে দুইটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সে অস্ফুটস্বরে প্রার্থনা জানাইল—হে মা কালী, ওর কোন অসুখ করে দাও, যাতে আজ ওর যাওয়া না হয়! হে হরি, ওর খুব জ্বর করে দাও, যাতে ও আজ না যেতে পারে!

পুষ্প দেখিল দেবতারা তাহার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না, সোমনাথের যাইবার সময় আগাইয়া আসিল। হতাশ হইয়া লোকের ভিড় হইতে সরিয়া সিঁড়ির পাশে খালি ঘরের এক কোণে বসিয়া পুষ্প কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখমুখ আরক্ত করিয়া তুলিল।

যাহারা সরস্বতীকে সাজাইতেছিল তাহাদিগকে তাগিদ দিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গিয়া সোমনাথ দেখিল পাশের ঘরের এক কোণে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পুষ্পের মত কে বসিয়া আছে।

ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হইয়া সোমনাথ দেখিল পুষ্পই বটে। সে বলিল—পুষ্প, আমরা এবার রওনা হব।

দুই আরক্ত চোখ তুলিয়া পুষ্প চাহিল। এক দৃষ্টে সোমনাথের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আবার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

সোমনাথ নির্বাক হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল।

বর কনে যাত্রা করিল। পুষ্প তখনও একভাবে বসিয়া রহিয়াছে। পরাশ্রিতা, ক্ষুদ্র পুষ্পের কথা কাহারও মনে হইল না।

**লুপুংগুটু**

উদয়ন, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত, সমালোকগণ কর্তৃক বহু প্রশংসিত নয়টি গল্পের সংগ্রহ। "লুপুংগুটু" চাইবাসার কাছে একটি হো পল্লীর নাম, প্রথম গল্পটি শেষ হইয়াছে এই আদিবাসী পল্লীর পটভূমিকায়। এই সংগ্রহে আছে সংস্কৃত কাব্য, নাটক, কথা সাহিত্যের রচনাশৈলী, ভাব ও বর্ণনা বৈভবের দর্শনস্বরূপ, প্রাচীন ভারতের বসন্তোৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত বিখ্যাত গল্প "কনকলেখা"। বিদগ্ধা, সৌন্দর্যশালিনী বারবনিতা কনকলেখা এথেন্সের পেরিক্লিস যুগের hetaera—কুলশ্রেষ্ঠা আসপাসিয়ার কথা, মৃচ্ছ-কটিকের বসন্তসেনার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। আর আছে বাস্তব ও অবাস্তব পরিবেশের বিস্ময়কর সমাবেশে রচিত প্রসিদ্ধ গল্প কীর্তি নারায়ণ। মূল্য ২৲

TE CENTRAL LIBRARY; W... ...GAL
ESSION NO ........................

আগমনী প্রকাশক
৯৭ বালিগঞ্জের প্লেস, কলিকাতা-১৯

**দেবানন্দ**

'E.

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস আশ্রয় করিয়া রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস। ১৯০৬ হইতে ১৯০৮এর মধ্যে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের আশা আশঙ্কা, ভাব ভাবনা, উপলব্ধি ও উদ্যমের জীবন্ত চিত্র। সে দিনের শিক্ষিত, আদর্শবাদী, আত্মত্যাগী, অমিতকর্মী তরুণ বাংলার বিগ্রহ দেবানন্দ। তাহার সঙ্গে পরিচয় এ যুগের তরুণের পক্ষে হইবে পঞ্চাশ বছর আগে তোলা তাহার নিজের বিস্মৃত চিত্র দর্শন।

পঞ্চাশ বৎসরে তিলে তিলে বৃদ্ধি পাইয়া যে সমস্যা দেশ, সমাজ, মানুষের জীবন ও হৃদয়কে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়াছে তাহার কুটিল, কণ্টকিত, কৃষ্ণবর্ণমূল মাটি খুঁড়িয়া প্রদীপ্ত আলোকে সকলের দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে, এই উপন্যাসে।

মূল্য ৪৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

**স্ফুলিঙ্গ**

জাতীয় আন্দোলনের প্রমাণিক ইতিহাস আশ্রয় করিয়া রচিত তৃতীয় উপন্যাস। ১৯০৮ (দ্বিতীয়ার্দ্ধ) হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার সময় পর্যন্ত কালের বাংলা দেশের কাহিনী। মূল্য ২॥০

STATE CENTRAL LIBRARY, W...
ACCESSION NO........................

আগমনী প্রকাশক
৯৭ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯